ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্ব জগতকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইবাদত করা। এই ইবাদত তথা সহীহ ঈমান ও নেক আমলের মধ্যেই মানুষের শান্তি ও কল্যাণ নিহিত। আর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতিতে বেইজ্জতি, ধ্বংস ও জাহান্নাম অনিবার্য। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় ও কুদরতের বর্ণনা দিয়ে তাদের থেকে নিজের প্রভুত্বের স্বীকারোক্তিমূলক অঙ্গীকার নেয়ার পর দুনিয়াতে তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন অসংখ্যা নবী, রাসূল ও পয়গাম্বর(আ)। সকল পয়গাম্বরের মৌলিক শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর প্রতি ও হাশর-নাশরের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল ইত্যাদি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছেন।
ঈমান ও আমল উভয়টা মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়। সুতরাং, মেহনত-মুজাহাদা ও কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে উক্ত মহামূল্যবান দু'টি বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে লাভ করা এবং তা খুব মজবুত ও দৃঢ় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য।
উল্লেখ্য যে, আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান দ্বারাও জান্নাত লাভ হবে (যদিও তা প্রথম অবস্থায় না হোক), কিন্তু সহীহ ঈমান ব্যতীত হাজারো আমল একেবারেই মূল্যহীন। যথার্থ ঈমান ব্যতীত শুধু আমল দ্বারা নাজাত পাওয়ার কোন সুরত নেই।
দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে চরম ফিতনার যুগে অনেক মানুষ সকালে মু'মিন থাকলেও বিকালে ঈমানহারা হচ্ছে, আবার কেউ বিকালে মু'মিন থাকলেও সকালে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু মানুষের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণের জন্য যথার্থ ব্যবস্থা সমাজে নেই। অথচ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দরুন এতদসম্পর্কিত অধিকসংখ্যক কিতাবপত্র রচনা ও আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকা ছিল একান্ত জরুরী।
এতদুদ্দেশ্যে আমি নালায়েক 'আকীদাতুত তাহাবী, শরহে আকায়িদ, তা'লীমুদ্দীন, ফুরুউল ঈমান'সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে সহীহ আকীদাসমূহ পেশ করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। যাতে করে সাধারণ মানুষের বুনিয়াদী ঈমান-আকীদা সহীহ হয়ে যায়। পাশাপাশি তা পরিপূর্ণ ও মজবুত করার জন্য ঈমানের শাখাগুলোর বিবরণ পেশ করেছি। আর ঈমান হিফাযতের জন্য ভ্রান্ত আকীদা, কুফরী ও শিরকী কথা এবং ভুল রাজনৈতিক দর্শনের বর্ণনা দিয়েছি। যেন কেউ কুফরী আকীদা পোষণ করে নিজের ঈমান ধ্বংস করে না ফেলে। আর ৪র্থ অধ্যায়ের শেষাংশে গুনাহে কবীরার বিবরণ এজন্য পেশ করা হয়েছে, যাতে করে এগুলোকে মানুষ গুনাহ এবং আল্লাহর নাফরমানী বলে বিশ্বাস করে নিজেকে এসব কাজ থেকে দূরে রাখে। গুনাহে কবীরাকে হালাল বা জায়িয মনে করলে মানুষ ঈমানহারা হয়ে যেতে পারে। এজন্য গুনাহের ইলম থাকা ঈমানের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ বিষয়াদি মিলে বইটি রুগ্ন মুসলিম জাতির রোগ নিরাময়ের জন্যে বিশেষ কার্যকর হবে বলে আল্লাহর দরবারে আশা করি। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন এ কিতাবটি কবুল করেন এবং এটাকে মুসলিম মিল্লাতের হিদায়াতের জারি'আ করেন। আমীন।

বিনীত
মনসূরুল হক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

সূচিপত্র

অধ্যায় এক

সহীহ ঈমানের কষ্টিপাথর

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

তরজমা :

রাসূল ঈমান আনয়ন করেছেন ঐ সকল বস্তু সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর নবীগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর নবীগণের মাঝে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই, ওহে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সকলেই আপনারা দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

[সূরা : সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৮৫।]

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর ও কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে"।

[সূরা : সূরাহ নিসা, আয়াত ১৩৬।]

হাদীসে জিবরাঈলে উল্লেখ আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছদ্মবেশে এসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কাকে বলে? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

اَنْ تُؤ مِنَ بِا للّٰهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه والْيَوْمِ الاَخِرِ وَتُؤْمِنُ بِا لْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَرِّه

ঈমানের হাকীকত হলো, তুমি মনে-প্রাণে বদ্ধমূলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ তা'আলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, আসমানী কিতাব সমূহের ওপর, আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের ওপর এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়ার ওপর। [সূত্রঃ বুখারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২ ও মুসলিম। মিশকাত শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১]

উল্লেখিত আয়াত ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এ হাদীসটি 'ঈমানে মুফাসসাল'-এর ভিত্তি। ঈমানে মুফাসসালের মাধ্যমে এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি জানানো হয় এবং মনে-প্রাণে বদ্ধমূল বিশ্বাসের ঘোষণা করা হয় যে,

أَ مَنْتُ بِا للهِ وَ مَلأَئِكَتِه وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِه وَالْيَوْ مِ الأخِرِ وَالقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ ا للهِ تَعَالي والْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

আমি ঈমান আনলাম বা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করলাম-

১. আল্লাহ তা'আলাকে, ২. তাঁর ফেরেশতাগণকে,

৩. তাঁর প্রেরিত সকল আসমানী কিতাবকে,

৪. তাঁর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলকে,

৫. কিয়ামত দিবসকে অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগত একদিন শেষ হবে, তাও বিশ্বাস করি,

৬। তাকদীরকে বিশ্বাস করি অর্থাৎ জগতে ভালো-মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, তাঁরই পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং

৭। মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন পুর্নবার জীবিত হতে হবে, তাও অটলভাবে বিশ্বাস করি।

উল্লেখিত ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৭নং বিষয় ৫নং বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত একটি প্রশাখা। তবে তার বিশেষ গুরুত্বের কারণে তাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো ঈমানের আরকান বা মূলভিত্তি। ঈমানের এ বিষয়গুলো ব্যখ্যাসহকারে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা জরুরী। ঈমানের এ সকল বুনিয়াদী বিষয়গুলো সামনে ব্যাখ্যাসহকারে পেশ করা হবে-

ঈমানের সংজ্ঞা :
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যত বিধান-আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমানীত হয়েছে তার কোন একটি বাদ না দিয়ে সব গুলোকে মনে প্রাণে বদ্ধমূল ভাবে বিশ্বাস করা।
আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে এবং পূর্ণভাবে আমল করার মাধ্যমে এ ঈমান কামিল বা শক্তিশালী হয়।
আর আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনে ত্রুটি করলে ঈমান নাকেস বা দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ঈমানের নূর-নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে এবং তাওবা না করলে আল্লাহ না করুন ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
কুফ্‌র এর সংজ্ঞা : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি বিধান-আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন বিষয় সম্বন্ধে অন্তরে সন্দেহ পোষণ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ঠাট্টা মজা করা। উল্লেখিত কাজের দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার পিছের জীবনের সকল ইবাদত-বন্দেগী ও আমল নষ্ট হয়ে যায়। এবং বিবাহিত হলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়।
আল্লাহ না করুন এ অবস্থা কারো হলে তার জন্য জরুরী হল, নতুনভাবে কালেমা পড়ে তওবা ইস্তিগফার করে ঈমান দোহরায়ে নিয়ে বিবাহ দোহরায়ে নেয়া।
কুফ্‌র এর প্রকারভেদ : যদিও কুফ্‌রের বিভিন্ন প্রকার আছে তবে এর প্রত্যেকটি দ্বারা মানুষ ঈমান হারা হয়ে কাফির ও বেঈমান হয়ে যায়। সুতরাং এ সবগুলো বেঁচে থাকা ফরজ।
১। কুফ্‌রে ইনকার : অন্তর এবং যবান উভয়ের মাধ্যমে দ্বীনি বিষয় বা বিষয়সমূহ অস্বীকার করা। যেমন: মক্কার কাফিরগণ।
২। কুফ্‌রে জুহুদ : অন্তরে বিশ্বাস রাখা কিন্তু মুখে অস্বীকার করা। যেমন: মদীনার ইয়াহুদগণ।
৩। কুফ্‌রে 'ইনাদ : অন্তরে দ্বীনকে বিশ্বাস করে এবং মুখেও স্বীকার করে। কিন্তু ইসলামের হুকুম আহকাম কে মান্য করে না। অন্যান্য দ্বীন বাতিল হয়ে গিয়েছে তা বিশ্বাস করে না। যেমন: আদমশুমারীর অনেক নামধারী মুসলমান যারা কখনো সহীহ দ্বীনী পরিবেশে আসে না।
উল্লেখ্য, উল্লেখিত ৩টির যে কোন একটি পাওয়া গেলে তার ঈমান চলে যাবে।

৪। কুফ্‌রে যানদাহকাহ :
বাহ্যিকভাবে দ্বীনের সব কিছু স্বীকার করে কোন বিষয়ে অস্বীকার করে না কিন্তু দ্বীনের কোন বিষয়ে এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যা– উম্মতের ইজমা পরিপন্থী যেমন– কাদিয়ানীগণ খতমে নবুওয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের ভন্ড নবী কে প্রমাণ করে। তেমনিভাবে কেউ দ্বীনের অর্থ করে হুকুমতে ইসলামী।

এখান থেকে ঈমান মুফাসসালে বর্ণিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

১. আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান
আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলীনয়। তাঁর কোন প্রকার অংশ বা অংশীদার বা শরীক নেই, তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। তিনিই সকলের সব অভাব পূরণকারী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। কোন জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তা'আলাকে আয়ত্ব করতে পারে না। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। সারকথা, আল্লাহ তা'আলার বিষয়ে তিনটি কথা অবশ্যই মানতে হবে।
ক. তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। সৃষ্ট জীবের সাথে তাঁর কোন তুলনা হয় না।
খ. তাঁর অনেকগুলো অনাদি–অনন্ত সিফাত বা গুণ আছে, সেগুলো একমাত্র তাঁর জন্যেই নির্ধারিত। সেসব গুনের মধ্যে অন্য কেউ শরীক নেই। যেমন: তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, হায়াত–মওতদাতা, বিধানদাতা, গায়েব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। অন্য সবকিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল, কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। সবকিছুর ওপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সবকিছুর ওপরই তাঁর ক্ষমতা চলে। আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, সব–ই তাঁর মুখাপেক্ষী।

তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি আগুণকে পানি এবং পানিকে আগুণ করতে পারেন। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান, তিনি হুকুম করলে মুহূর্তের মধ্যে এসব নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে।
তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি না জানেন-এমন কিছুই নেই। মনের মধ্যে যে ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয়, তাও তিনি জানেন। তিনি সবকিছুই দেখছেন। সবকিছুই শুনছেন। মৃদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ আওয়াজও তিনি শুনেন।
গাইবের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ গাইব জানেন না। এমনকি নবী-রাসূল অলী ও নন।
আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র হাযির-নাযির। তিনি ছাড়া আর কেউ হাযির নাযির নন। এমনকি নবী-রাসূল অলীগণও নন।
তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। কোন পীর, ওলী, পয়গাম্বর বা ফেরেশতা তাঁর ইচ্ছাকে রদ বা প্রতিহত করতে পারে না। তিনি আদেশ ও নিষেধ জারি করেন।
তিনি একমাত্র বন্দেগীর উপযুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী করা যায় না।
তাঁর কোন অংশীদার কিংবা সহকর্মী বা উযীর-নাযীর নেই। তিনি একক কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই সর্বোপরি বাদশাহ, রাজাধিরাজ; সবই তাঁর বান্দা ও গোলাম। তিনি বান্দাদের ওপর বড়ই মেহেরবান।
তিনি সব দোষ-ক্রটি হতে পবিত্র। তাঁর মাঝে আদৌ কোন রকমের দোষ-ক্রটি নেই। তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আদেশ-নিষেধ সবই ভালো ও মঙ্গলময়, কোন একটিতেও বিন্দুমাত্র অন্যায় বা দোষ নেই। তিনিই বিপদ-আপদ দেন এবং বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার করেন, অন্য কেউ কোন প্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্তি দিতে পারে না।
প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা তাঁরই। তিনিই সকল সম্মান ও মর্যাদার অধিপতি। তিনিই প্রকৃত মহান। একমাত্র তিনিই নিজেকে নিজে বড় বলতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কারো এ রকম বলার ক্ষমতা ও অধিকার নেই।
তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং সৃষ্টি করবেন।
তিনি এমন দয়ালু যে, দয়া করে অনেকের গুনাহ তিনি মাফ করে দেন।
তিনি ক্ষমাশীল।
তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তাঁর প্রভাব ও প্রভুত্ব সকলের ওপর; কিন্তু তাঁর ওপর কারো প্রভাব বা প্রভুত্ব চলে না।

তিনি বড়ই দাতা। সমস্ত জীবের ও যাবতীয় চেতন-অচেতন পদার্থের আহার তিনি দান করেন। তিনি রুযীর মালিক। রুযী কমানো-বাড়ানো তাঁরই হাতে। তিনি যার রুযী কমাতে ইচ্ছা করেন, তার রুযী কম করে দেন। যার রুযী বাড়াতে ইচ্ছা করেন, বাড়িয়ে দেন।

কাউকে উচ্চপদস্থ বা অপদস্থ করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। এসবই তাঁরই ক্ষমতায়, তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারো এতে কোন রকম ক্ষমতা বা অধিকার নেই। তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে যার জন্যে যা ভালো মনে করেন, তার জন্যে তাই ব্যবস্থা করেন। তাতে কারো কোন প্রকার প্রতিবাদ করার অধিকার নেই।

তিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁর কোন কাজেই অন্যায় বা অত্যাচারের লেশমাত্র নেই। তিনি বড় সহিষ্ণু, অনেক কিছু সহ্য করেন। কত পাপিষ্ঠ তাঁর নাফরমানী করছে, তাঁর ওপর কত রকম দোষারোপ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত করছে, তারপরও তিনি তাদের রিযিক জারি রেখেছেন।

তিনি এমনই কদরশিনাস-গুণগ্রাহী এবং উদার যে, তাঁর আদৌ কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং তাঁর আদেশ পালন করলে, তিনি তার বড়ই কদর করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে আশাতীতরূপে পুরুস্কার দান করেন। তিনি এমনই মেহেরবান ও দয়ালু যে, তাঁর নিকট দরখাস্ত করলে [অর্থাৎ দু'আ করলে] তিনি তা মন্‌জুর করেন। তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত, তাঁর ভান্ডারে কোন কিছুরই অভাব নেই।

তিনি অনাদি-অনন্তকালব্যাপী সকল জীব-জন্তু ও প্রাণিজগতের আহার যোগান দিয়ে আসছেন। তিনি জীবন দান করেছেন, ধন-রত্ন দান করছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দান করেছেন। অধিকন্তু আখিরাতেও অসংখ্য ও অগণিত সাওয়াব ও নেয়ামত দান করবেন। কিন্তু তাঁর ভান্ডার তবুও বিন্দুমাত্র কমেনি বা কমবে না। তাঁর কোন কাজই হিকমত ও মঙ্গল ছাড়া নয়। কিন্তু সব বিষয় সকলের বুঝে আসে না। তাই নির্বুদ্ধিতাবশত কখনো না বুঝে দিলে দিলে বা মুখে প্রতিবাদ করে ঈমান নষ্ট করা উচিত নয়। তিনি সব কর্ম সমাধানকারী। বান্দা চেষ্টা করবে, কিন্তু সে কর্ম সমাধানের ভার তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যাস্ত।

তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার সকলকে জীবত করবেন। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তাঁর হাকীকত ও স্বরুপ এবং তিনি যে কত অসীম, তা কারো বোঝার ক্ষমতা নেই। কেবলমাত্র তাঁর সিফাত অর্থাৎ গুনাবলী ও তাঁর কার্যাবলীর দ্বারাই তাকে আমরা চিনতে পারি। মানুষ পাপ করে যদি খাঁটিভাবে তাওবা করে, তবে তিনি তা কবুল করেন। যে শাস্তির উপযুক্ত, তাকে তিনি শাস্তি দেন। তিনি হিদায়াত দেন। তাঁর নিদ্রা নেই। সমস্ত বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্বাবধানে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। তিনিই সমস্ত বিশ্বের রক্ষক। এ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে চিনবার জন্যে তাঁর কতগুলো সিফাতে কামালিয়া অর্থাৎ মহৎ গুনাবলীর বর্ণনা দেওয়া হলো। এতদ্ব্যতীত যত মহৎ গুণ আছে, আল্লাহ তা'আলা তৎসমুদয় দ্বারা বিভূষিত। ফলকথা এই যে, সৎ ও মহৎ যত গুণ আছে, অনাদিকাল যাবৎ সে সব আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু কোন দোষ ক্রুটির লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই। আল্লাহ তা'আলার গুণ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফের কোন কোন জায়গায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি আশ্চর্যান্বিত হন, হাসেন, কথা বলেন, দেখেন, শুনেন, সিংহাসনাসীন হন, নিম্ন আসমানে অবতীর্ণ হন। তাঁর হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে। এসব ব্যাপারে কখনো বিভ্রান্তিতে পড়তে বা তর্ক-বির্তক করতে নেই। সহজ-সরলভাবে আমাদের আকীদা ও একীন এই রাখা উচিত যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের মতো তাঁর ওঠা-বসা বা হাত-পা তো নিশ্চয়ই নয়। তবে কেমন? তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সাবধান! সাবধান!!! যেন শয়তান ধোঁকা দিয়ে গোলকধাঁধায় না ফেলতে পারে। একিনী আকীদা ও অটল বিশ্বাস রাখবেন যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্ঠজীবের সাদৃশ্য হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান।এ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারেনি। কখনো পারবেও না। তবে জান্নাতে গিয়ে জান্নাতীরা আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে। জান্নাত এটাই-সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হবে।

গ. একমাত্র তিনিই মাখলুকের ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত। আর কেউ ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আল্লাহ তা'লার ওপর ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়; বরং অস্তিত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে তার উপরোক্ত গুণবাচক কথাগুলো স্বীকার করাও জরুরী। নতুবা আল্লাহপাকের ওপর সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনা হবে না এবং সে ঈমান গ্রহণযোগ্যও হবে না।

আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক ৯৯টি নাম

১. الرحمن
অর্থ: অত্যন্ত দয়াবান।

২. الرحيم
অর্থ: পরম দয়ালু।

৩. الملك
অর্থ: অধিপতি।

৪. القدوس
অর্থ: পবিত্র।

৫. السلام
অর্থ: শান্তিময়।

৬. المؤمن
অর্থ: নিরাপত্তাবিধায়ক।

৭. المهيمن
অর্থ: রক্ষক।

৮. العزيز
অর্থ: পরাক্রমশালী।

৯. الجبار
অর্থ: শক্তিপ্রয়োগে সংশোধনকারী, প্রবল।

১০. المتكبر
অর্থ: মহিমানিত্ব।

১১. الخالق
অর্থ: স্রষ্টা।

১২. البارئ
অর্থ: উদ্ভাবনকর্তা, ক্রটিহীন স্রষ্টা।

১৩. المصور
অর্থ: আকৃতিদাতা।

১৪. الغفار
অর্থ: পরম ক্ষমাশীল।

১৫. القهار
অর্থ: মহাপরাক্রান্ত।

১৬. الوهاب
অর্থ: মহাদাতা।

১৭. الرزاق
অর্থ: রিযিকদাতা।

১৮. الفتاح
অর্থ: মহাবিজয়ী।

১৯. العليم

অর্থ: মহাজ্ঞানী।

২০. القابض

অর্থ: সংকোচনকারী।

২১. الباسط

অর্থ: সম্প্রসারণকারী।

২২. الخافض

অর্থ: পতনকারী, অবনমনকারী।

২৩. الرافع

অর্থ: উন্নয়নকারী।

২৪. المعز

অর্থ: সন্মানদাতা।

২৫. المذل

অর্থ: অপমানকারী।

২৬. السميع

অর্থ: সর্বশ্রোতা।

২৭. البصير

অর্থ: সম্যক দ্রষ্টা।

২৮. الحكم

অর্থ: মীমাংসাকারী।

২৯. العدل

অর্থ: ন্যায়নিষ্ঠ।

৩০. اللطيف

অর্থ: সূক্ষ্মদর্শী।

৩১. الخبير

অর্থ: সর্বজ্ঞ।

৩২. الحليم

অর্থ: ধৈর্যশীল।

৩৩. العظيم

অর্থ: মহিমাময়।

৩৪. الغفور

অর্থ: পরম ক্ষমাকারী।

৩৫. الشكور

অর্থ: গুণগ্রাহী।

৩৬. العلي

অর্থ: সর্বোচ্চ সমাসীন,
অতি উচ্চ।

৩৭. الكبير

অর্থ: সুমহান।

৩৮. الحفيظ

অর্থ: মহারক্ষক।

৩৯. المقيت

অর্থ: আহার্যদাতা।

৪০. الحسيب

অর্থ: হিসাব গ্রহণকারী।

৪১. الجليل
অর্থ: মহিমান্বিত।
৪২. الكريم
অর্থ: অনুগ্রহকারী।
৪৩. الرقيب
অর্থ: পর্যবেক্ষণকারী।
৪৪. المجيب
অর্থ: কবুলকারী।
৪৫. الواسع
অর্থ: সর্বব্যাপী।
৪৬. الحكيم
অর্থ: প্রজ্ঞাময়।
৪৭. الودود
অর্থ: প্রেমময়।
৪৮. المجيد
অর্থ: গৌরবময়।
৪৯. الباعث
অর্থ: পুনরুত্থানকারী।
৫০. الشهيد
অর্থ: প্রত্যক্ষকারী।
৫১. الحق
অর্থ: সত্যপ্রকাশক, হক।

৫২. الوكيل
অর্থ: কর্মবিধায়ক।

৫৩. القوى
অর্থ: শক্তিশালী।
৫৪. المتين
অর্থ: দৃঢ়তাসম্পন্ন।
৫৫. الولي
অর্থ: অভিভাবক।
৫৬. الحميد
অর্থ: প্রশংসিত।
৫৭. المحصى
অর্থ: হিসাব গ্রহণকারী।
৫৮. المبدئ
অর্থ: আদি স্রষ্টা।
৫৯. المعيد
অর্থ: পুন:সৃষ্টিকারী।
৬০. المحيي
অর্থ: জীবনদাতা।
৬১. المميت
অর্থ: মৃত্যুদাতা।
৬২. الحي
অর্থ: চিরঞ্জীব।
৬৩. القيوم
অর্থ: স্বপ্রতিষ্ঠ
সংরক্ষণকারী।
৬৪. الواجد
অর্থ: প্রাপক,
তিনি যা চান তাই পান।

৬৫. الماجد

অর্থ: মহান।

৬৬. الواحد

অর্থ: একক।

৬৭. الاحد

অর্থ: এক অদ্বিতীয়।

৬৮. الصمد

অর্থ: অনপেক্ষ।

৬৯. القادر

অর্থ: শক্তিশালী।

৭০. مقتدر

অর্থ: ক্ষমতাশালী।

৭১. المقدم

অর্থ: অগ্রবর্তীকারী।

৭২. لمؤخرا

অর্থ: পশ্চাদবর্তীকারী।

৭৩. الأول

অর্থ: সর্বপ্রথম অর্থাৎ অনাদি।

৭৪. لآخرا

অর্থ: শেষ অর্থাৎ অনন্ত।

৭৫. لظاهرا

অর্থ: প্রকাশ্য।

৭৬. لباطنا

অর্থ: গুপ্তসত্তা।

৭৭. الوالي

অর্থ: অধিপতি।

৭৮. المتعال

অর্থ: সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

৭৯. البر

অর্থ: কৃপাময়।

৮০. التواب

অর্থ: তওবা কবুলকারী।

৮১. المنتقم

অর্থ: শাস্তিদাতা।

৮২. العفو

অর্থ: ক্ষমাকারী।

৮৩. الرؤوف

অর্থ: দয়ার্দ্র।

৮৪. مالك الملك

অর্থ: সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

৮৫. ذو الجلال و الإكرام

অর্থ: মহিমাময় মহানুভব।

৮৬. المقسط

অর্থ: ন্যায়পরায়ণ।

৮৭. الجامع

অর্থ: একত্রকরণকারী।

৮৮. الغني

অর্থ: অভাবমুক্ত।

৮৯. المغني
অর্থ: অভাব মোচনকারী।

৯০. المانع
অর্থ: প্রতিরোধকারী।
৯১. لضارا
অর্থ:ক্ষতির ক্ষমতাকারী।
৯২. النافع
অর্থ: কল্যাণকারী।
৯৩. النور
অর্থ: জ্যোতির্ময়।
৯৪. الهادي
অর্থ: পথ প্রদর্শক।

৯৫. البديع
অর্থ: নমুনাবিহীন
সৃষ্টিকারী।
৯৬. الباقي
অর্থ: চিরস্থায়ী।
৯৭. الوارث
অর্থ: স্বত্বাধিকারী।
৯৮. الرشيد
অর্থ: সত্যদর্শী।
৯৯. الصبور
অর্থ: ধৈর্যশীল।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে এবং হাদীস গ্রন্থসমূহে এসবের বাইরেও আরো কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন:

১. اَلرَّبُّ
অর্থ: প্রতিপালক।
২. اَلْمُنْعِمُ
অর্থ: নিয়ামতদানকারী।
৩. اَلْمُعْطِيْ
অর্থ: দাতা।

৪.اَلصَّادِقُ
অর্থ: সত্যবাদী।
৫. اَسَّتَّارُ
অর্থ: গোপনকারী।

আল আসমাউল হুসনার যথাযথ বাংলা অনুবাদ কিছুতেই হয় না। এখানে যে বাংলা অর্থ দেওয়া হয়েছে, তা কেবল ইঙ্গিত মাত্র। আল আসমাউল হুসনার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক গুনাবলী আল্লাহর জন্য সত্তাগত, অনাদি অনন্ত, ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এ সকল গুণ কেবল আল্লাহর দেয়া অস্থায়ী এবং সীমিত।

২. **ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান**

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ এক ধরণের মাখলুককে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করে তাদেরকে

আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলে। তাঁরা পুরুষ বা মহিলা কোনটিই নন। বরং তাঁরা ভিন্ন ধরনের মাখলুক। অনেক ধরণের কাজ আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সোপর্দ করে রেখেছেন। যেমন: নবীগণের (আ) নিকট অহী আনয়ন করা, মেঘ পরিচালনা করা, রুহু কবয করা, নেকী-বদী লিখে রাখা ইত্যাদি। তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাঁরা বিন্দুমাত্র আল্লাহর নাফরমানী করেন না। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা যথা: হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মীকাঈল (আ), হযরত ইসরাফীল (আ) ও হযরত আযরাঈল (আ) অতিপ্রসিদ্ধ।

জিন সম্বন্ধে আকীদা

আরেক প্রকার জীবকে আল্লাহ তা'আলা আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করে আমাদের চক্ষুর অগোচর করে রেখেছেন। তাদেরকে জিন বলে। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সবরকম হয়। তারা নারী-পুরুষও বটে এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের খানা-পিনার প্রয়োজনও হয়। জিন মানুষের ওপর আছর করতে পারে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বড় দুষ্ট হচ্ছে 'ইবলীস শয়তান'। হাশরের ময়দানে জিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে। এ কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে। সুতরাং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

৩. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি ও জিন জাতির হিদায়াতের জন্যে ছোট-বড় বহু কিতাব হযরত জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে পয়গাম্বরগণের (আ) ওপর নাযিল করেছেন, তারা সে সব কিতাবের দ্বারা নিজ নিজ উম্মতকে দ্বীনের কথা শিখিয়েছেন। উক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে চারখানা কিতাব বেশি প্রসিদ্ধ, যা প্রসিদ্ধ চারজন রাসূলের (আ) ওপর নাযিল করা হয়েছে। তার মধ্যে কুরআন শরীফ সর্বশেষ কিতাব। এরপরে আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের হুকুমই চলতে থাকবে। পবিত্র কুরআনের কোন সূরা আয়াত এমনকি কোন শব্দ হরকত,

নুকতার মধ্যে এমনিভাবে অর্থের মাঝেও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিলুপ্তি আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসাও সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনের হিফাযতের ওয়াদা করেছেন এবং তা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। অন্যান্য কিতাবগুলোকে বেদ্বীন লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সেগুলোর হিফাযতের ওয়াদা করেন নি। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি হরফ এমনকি প্রতিটি নুকতাহ ও হরকতের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কোন একটি অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। কাফের হয়ে যাবে।

কুরআন শরীফ ও তার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে তিনি দ্বীন সম্বন্ধীয় সব কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন। কোন অংশ গোপন রাখেন নি। সুতরাং, এখন নতুন কোন কথা বা প্রথা চালু করা দুরস্ত নয়। দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নতুন কথাকে ইলহাদ বা বিদ'আত বলে। যা অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ ও পথভ্রষ্টতা।

কুরাআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া কুফরী কাজ। কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফরী কাজ। তেমনিভাবে কোন হালালকে হারাম মনে করা বা কোন অকাট্য হারাম বা গুনাহকে হালাল হিসাবে বিশ্বাস করা কুফরী। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়।

৪. নবী-রাসূল (আ) এর ওপর ঈমান :

নবী-রাসূল (আ)- এর ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্যে এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য স্বীয় বান্দাদের মধ্যে হতে বাছাই করে বহুসংখ্যক পয়গাম্বর অর্থাৎ নবী-রাসূল (আ) মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যাতে করে মানুষ আল্লাহর সুন্তুষ্টি হাসিল করে দুনিয়াতে কামিয়াব হতে পারে এবং পরকালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে বেহেশত হাসিল করতে পারে।

পয়গাম্বরগণ সকলেই মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা কোন প্রকার পাপ করেন না। নবীগণ মানুষ। তাঁরা খোদা নন। খোদার পুত্র নন। খোদার রূপান্তর (অবতার) নন। বরং তাঁরা হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। নবীগণ আল্লাহর বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সঠিক সংখ্যা কুরআন শরীফ

বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বর্ণনা করেন নি। কাজেই নিশ্চিতভাবে তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না। এ কথা যদি ও প্রসিদ্ধ যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন কিন্তু কোন সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বহুসংখ্যক পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে তাঁদের দ্বারা অনেক অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। ঐ সব ঘটনাকে মু‘জিযা বলে। নবীগণের মু‘জিযাসমূহ বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গ।

পয়গাম্বরগণের (আ) মধ্যে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আগমন করেছেন হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ অথচ সর্বপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে অন্য কেউ দুনিয়াতে নবী বা রাসূল হিসেবে আগমন করেননি এবং করবেনও না। হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের পূর্বে যদিও আগমন করবেন, কিন্তু তিনি তো পূর্বেই নবী ছিলেন। নতুন নবী হিসেবে তিনি আগমন করবেন না। আমদের নবী খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষনবী। তাঁর পরে নতুনভাবে আর কোন নবী আসবেন না; তাঁরপর আসল বা ছায়া কোনরূপ নবীই নাই। বরং তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের নবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত জিন বা ইনসান ছিল, আছে বা সৃষ্টি হবে, সকলের জন্যেই তিনি নবী। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই হুকুম এবং তরীকা সকলের মুক্তি ও নাজাতের জন্যে অদ্বিতীয় পথ হিসেবে বহাল থাকবে। অন্য কোন ধর্ম, তরীকা বা ইজম এর অনুসরণ কাউকে আল্লাহর দরবারে কামিয়াব করতে পারবে না। আমাদের নবীর পরে অন্য কেউ নবী হয়েছেন বা নবী হবেন বলে বিশ্বাস করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কেউ নতুন নবী হওয়ার দাবি করলে বা তার অনুসরণ করলে, সেও কাফির বলে গণ্য হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এখনও আসমানে জীবত আছেন। তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন, ইহা সত্য। কুরআন হাদীসে প্রমাণিত।

তাই ইহা বিশ্বাস করতে হবে, অন্যথায় ঈমান থাকবে না, তিনি কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে জমিনে অবতরণ করবেন। আমাদের নবীর অনুসারী হয়ে। হযরত ঈসা (আঃ)- এর ব্যাপারে পুত্রবাদ ও কতৃত্ববাদের বিশ্বাস কুফরী।
দুনিয়াতে যত পয়গাম্বর এসেছেন, সকলেই আমাদের মাননীয় ও ভক্তির পাত্র। তাঁরা সকলেই আল্লাহর হুকুম প্রচার করেছেন। তাঁদের মধ্যে পরস্পরে কোন বিরোধ ছিল না। সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ছিলেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা অবশ্য হিকমতের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হুকুম জারি করেছেন। আর এই সামান্য বিভিন্নতাও শুধু আমলের ব্যাপারে, ঈমান আকীদার ব্যাপারে নয়। আকীদাসমূহ আদি হতে অন্ত পর্যন্ত চিরকাল এক। আকীদার মধ্যে কোন প্রকার রদবদল বা পরিবর্তন হয়নি, আর হবেও না কখনো। পয়গাম্বরগণ সকলেই কামিল ছিলেন। কেও নাকিস বা অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কারো মর্যাদা ছিল বেশি, কারো মর্যাদা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সকল নবী নিজ নিজ কবরে জীবত আছেন। এজন্য নবীগণকে 'হায়াতুন্নবী' বলা হয়।
উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্তবা সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই বলে নবীগণের মধ্যে তুলনা করে একজনকে বড় এবং একজনকে হেয় বা ছোট করে দেখানো বা বর্ণনা করা নিষেধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম-এর সমস্ত কথা মেনে নেয়া জরুরী। তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করলে বা সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে কিংবা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে বা দোষ বের করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। ঈমানের জন্যে আমাদের নবীর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ ভ্রমণের কথা বিশ্বাস করাও জরুরী। যে মি'রাজ বিশ্বাস করে না, সে বেদ্বীন। তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে।

সাহাবীর পরিচিতি

যেসব মুসলমান আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, এবং ঈমানের হালতে ইনতিকাল করেছেন, তাঁদেরকে 'সাহাবী' বলা হয়।

সাহাবীগণের অনেক ফযীলতের কথা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। সমস্ত সাহাবী (রাঃ) গণের সাথে মুহাব্বত রাখা ও তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের কাউকে মন্দ বলা আমদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। সাহাবীগণ যদিও মাসুম বা নিষ্পাপ নন, কিন্তু তাঁরা মাগফূর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুতরাং, পরবর্তী লোকদের জন্য তাঁদের সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই। তাঁরা সমালোচনার ঊর্দ্ধে।

তাঁরা সকলেই আদিল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী এবং সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের দোষ চর্চা করা হারাম এবং ঈমানবিধ্বংসী কাজ। 'আকীদাতুত তাহাবী' কিতাবে উল্লেখ আছে, 'সাহাবীগণের প্রতি মুহাব্বত-ভক্তি রাখা দ্বীনদারী ও ঈমানদারী এবং দ্বীনের ও ঈমানের পূর্ণতা। আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাদের বিরূপ সমালোচনা করা কুফরী, মুনাফেকী এবং শরী'আতের সীমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সমস্ত সাহাবীগণের মাঝে চারজন সর্বপ্রধান। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), তিনিই প্রথম খলীফা বরহক এবং তিনি সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী (রাঃ) এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)। সকল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার চির সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। বিশেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। এই দশজনকে আশারায়ে মুবাশশারা (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন -১. হযরত আবু বকর (রাঃ), ২. হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), ৩। হযরত উসমান (রাঃ) ৪. হযরত আলী (রাঃ), ৫. হযরত তালহা (রাঃ), ৬. হযরত যুবায়ের (রাঃ) ৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), ৮. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাঃ), ৯. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ), ১০. হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)।

নবী (আঃ) এর বিবি ও আওলাদ সম্বন্ধে আকীদা

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবি ও আহল-আওলাদগণের (রাঃ) বিশেষভাবে তাযীম করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আওলাদগণের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং বিবিগণের মধ্যে হযরত খাদীজা ও আয়িশা (রাঃ) এর মর্যদা সবচেয়ে বেশি।

ওলী-বুযুর্গদের সম্বন্ধে আকীদা

ওলী-বুযুর্গদের কারামত সত্য। কিন্তু ওলী-বুযুর্গ গণ যত বড়ই হোন না কেন, তাঁরা নবী রাসূল (আঃ) তো দূরের কথা, একজন সাধারণ সাহাবীর সমতূল্যও হতে পারেন না। অবশ্য হাক্কানী পীর-মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরাম যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়ারিশ এবং দ্বীনের ধারক বাহক সুতরাং, তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা, তাঁদের সঙ্গ লাভ করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা সকল মুসলমানের জন্য জরুরী। দ্বীনের খাদিম হিসেবে তাঁদেরকে হেয় করা, কিংবা গালি দেয়া কুফরী কাজ। মানুষ যতই খোদার পেয়ারা হোক, হুঁশ-জ্ঞান থাকতে শরী'আতের হুকুম-আহকামের পাবন্দী অবশ্যই তাকে করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত কখনো মাফ হবে না। তেমনিভাবে মদ খাওয়া, গান-বাদ্য করা, পরস্ত্রী দর্শন বা স্পর্শ করা কখনো তার জন্যে জায়িয হবে না। হারাম বস্তুসমূহ হারামই থাকবে এবং হারাম কাজ করে বা ফরয বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে কেউ কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

৫. কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান

কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান আনার অর্থ-কুরআন ও হাদীসে কিয়ামতের যতগুলো নির্দশন বর্ণিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই ঘটবে-দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করা। যেমন- বিশ্বাস করা যে, ইমাম মাহদী (রহ) আবির্ভূত হবেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে বাদশাহী করবেন। 'কানা দাজ্জাল' অনেক অনেক ফিতনা-ফাসাদ করবে, তাকে খতম করার জন্য হযরত ঈসা (আ) আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং তাকে বধ করবেন।

'ইয়াজুজ মা'জুজ' অতিশক্তিশালী পথভ্রষ্ট শ্রেণীর মানুষ। তারা দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দেবে। অতঃপর আল্লাহর গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। 'দাব্বাতুল আরদ' নামে এক আশ্চর্য জানোয়ার পৃথিবীতে জাহির হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে।

কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কুরআন শরীফ উঠে যাবে। এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটবে। তারপরে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত মু'মিনগণ মারা যাবেন এবং সমস্ত দুনিয়া কাফিরদের দ্বারা ভরে যাবে।আর তাদের উপর কিয়ামত কায়িম হবে।

সারকথা, কিয়ামতের সকল নির্দশন যখন পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন । তাতে কতিপয় জিনিস ব্যতীত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সমস্ত জীবজন্তু মরে যাবে, যারা পূর্বে মারা গেছে, তাদের রুহ বেঁহুশ হয়ে যাবে। অনেক দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে। আল্লাহর নির্দেশে তারপর আবার-শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। তাতে সমস্ত আলম আবার জীবিত হয়ে উঠবে এবং কেয়ামতের ময়দানে সকলে একত্রিত হবে।

কিয়ামতের দিন সূর্য অতি নিকটে চলে আসবে। ফলে মানুষের খুব কষ্ট হবে। কষ্ট দূর করার জন্য লোকেরা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে বড় বড় নবীগণের (আ) নিকট সুপারিশের জন্য যাবে। কিন্তু কেউ সুপারিশ করার সাহস পাবে না। অবশেষে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআতে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।

মীযানের মাধ্যমে নেকী-বদীর হিসাব হবে। অনেকে বিনা হিসেবেই বেহেশতে চলে যাবে, আবার অনেককে বিনা হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হিসাবের পর নেককারদের ডান হাতে এবং বদকারদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

সেদিন জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকে পার হতে হবে। নেককার লোকেরা তা দ্রুত পার হয়ে যাবেন, কিন্তু বদকার লোকেরা পার হওয়ার সময় পুলসিরাতের নিচে অবস্থিত দোযখের মধ্যে পড়ে যাবে।

সেই কঠিন দিনে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতদেরকে হাউজে কাউসারের শরবত পান করাবেন। তা এমন তৃপ্তিকর হবে, যা পান করার পর পিপাসার নামমাত্র থাকবে না। জাহান্নামের মাঝে ভয়ানক অগ্নিকুন্ডসহ বিভিন্ন রকম শাস্তির উপকরণ মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, সে যতবড় পাপী হোক না কেন, স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করবে, অতঃপর নবীগণের (আ) কিংবা অন্যদের সুপারিশে দোযখ হতে মুক্তি লাভ করে কোন এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যারা কুফরী করেছে, বা শিরকী করেছে, তারা যদি দুনিয়াতে অনেক ভাল কাজও করে থাকে, তথাপি তারা কখনো

কিছুতেই দোযখ হতে মুক্তি পাবে না। দোযখীদের কখনো মৃত্যুও আসবে না। তারা চিরকাল শাস্তিই ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন আশা-আকঙ্খা পূর্ণ হবে না।

দোযখের ন্যায় বেহেশতকেও আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেখানে নেক লোকদের জন্যে অগণিত ও অকল্পনীয় শান্তির সামগ্রী ও নেয়ামত মওজুদ আছে। যে একবার বেহেশতে যাবে, তার আর কোন ভয় বা ভাবনা থাকবে না। এবং কোনদিন তাকে বেহেশত থেকে বের হতে হবে না। বরং চিরকাল সেখানে জীবিত অবস্থায় থেকে সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকবে।

বেহেশতের সকল নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নেয়ামত। যদিও দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু মু'মিনগণ বেহশতের মধ্যে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবেন। বেহেশতের মধ্যে বাগ-বাগিচা, বালাখানা, হুর-গিলমান, বিভিন্ন রকম নহর ও নানারকম অকল্পনীয় সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী সর্বদা মওজুদ থাকবে। জান্নাতীদের দিলের কোন নেয়ামত ভোগ করার ইচ্ছা হওয়ার সাথে সাথে তা পূর্ন হবে।

দুনিয়াতে কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না। অবশ্য কুরআন-হাদীসে যাদের নাম নিয়ে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে বলা যাবে। তবে কারোর ভাল আমল বা ভাল আখলাক দেখে তাকে ভাল মনে করা উচিত।

৬. তাকদীরের ওপর ঈমান

তাকদীরের ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, মনে-প্রাণে অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমগ্র বিশ্বজগতে ভালো বা মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানেন, লাউহে মাহফুযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন তেমনই হয়, তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা। তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী । তার ক্ষমতা ছিন্ন করে বের হতে পারে, এমন কেউ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, আদি-অন্ত সবকিছুই তিনি সঠিকভাবে জানেন।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ বুঝবার এবং কাজ করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং ইচ্ছাশক্তিও দান করেছেন। তার দ্বারা নিজ ক্ষমতায়, নিজ ইচ্ছায় সে পাপ ও পুন্যের কাজ করে। পাপ কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা অসুন্তুষ্ট হন এবং পুণ্যের কাজ করলে সন্তুষ্ট হন। কাজ করা ভিন্ন কথা, আর সৃষ্টি করা ভিন্ন কথা। সৃষ্টি তো সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন।

মানুষ জীবনভর যতই ভাল বা মন্দ থাকুক না কেন, যে অবস্থায় তার ইনতিকাল হবে, সে হিসেবে শান্তি বা শাস্তি পাবে। যেমন, এক ব্যক্তি সারাজীবন মু'মিন ছিল, কিন্তু মউতের পূর্বে ইচ্ছাপূর্বক কুফরী বা শিরকী কথা বললো বা ঈমানবিরোধী কাজ করলো, তাহলে সে কাফির সাব্যস্ত হবে। সুতরাং, দিলের মধ্যে আল্লাহর রহমতের আশা ও গযবের ভয় রাখা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অসাধ্য কোন হুকুম করেননি। যা কিছু আদেশ করেছেন বা নিষেধ করেছেন, সবই বান্দার আয়ত্বে ও ইখতিয়ারে।

আল্লাহ তা'আলার ওপর কোন কিছু করা ওয়াজিব নয়। তিনি যা কিছু দান করেন, সবই তাঁর রহমত এবং মেহেরবানী মাত্র। তাঁর ওপর কারো কোনরূপ দাবি বা হুকুম কিংবা কর্তৃত্ব চলে না। ছোট হতে ছোট গুনাহের কারণে তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং বড় থেকে বড় পাপও তিনি মার্জনা করতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি কাউকে দোযখে দিলে, সেটাই ইনসাফ এবং কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করালে, সেটা তার রহমত। আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।

৭. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আমাদের বর্তমান জীবন পরীক্ষার নিমিত্ত। মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে এ জীবনের সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন। মৃত্যুর পর একটি রয়েছে কবরে সাময়িক ফলভোগের বরযখী যিন্দেগী, আর পরবর্তীতে কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার পর আসবে পরকালীন আসল যিন্দেগী। পূর্ণাঙ্গ হিসাব-কিতাবের পর বান্দার জন্যে নির্ণীত হবে বেহেশত বা দোযখের সেই অনন্ত যিন্দেগী। কিয়ামতের পূর্বেই মুনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তরের পর কবরের ভিতরে নেককারদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করা হয় এবং বদকারদের জন্যে আযাব শুরু হয়ে যায়।

কবর দ্বারা উদ্দেশ্য, আলমে বরযখ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের যিন্দেগীর মধ্যবর্তী যিন্দেগী। সকল মানুষ ইনতিকালের পর সেখানেই পৌঁছে যায়, তাই তাকে কবর দেয়া হোক বা না-ই হোক। যেমন-অনেককে বাঘ বা কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলে, কতেককে আগুনে জ্বালানো হয়, তারাও সেখানে উপস্থিত হয়। কবর বলে মূলত এ জগতকেই বোঝানো হয়। নেক লোকদের জন্যে কবর জান্নাত বা বেহশতের একটা অংশ হয়ে যায়। তারা সেখানে আরামের সাথে অবস্থান করতে থাকে। মৃত ব্যক্তির জন্যে দু'আ করলে বা কিছু সদকা করলে, সে তা পেয়ে খুশি হয় এবং তাতে তার বড়ই উপকার হয়।

উল্লেখ্য, ঈমানে মুফাসসালের এ অংশটি ভিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং ৫নং বিষয় অর্থাৎ কিয়ামতের ওপর ঈমান আনারই একটি স্তর; কিন্তু বিষয়টি জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় ভালভাবে বোঝানোর লক্ষ্যে আলাদা ধারার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হলো সহীহ ঈমানের সাতটি আরকান এবং তার কিছুটা ব্যাখ্যা ও তাফসীর। যে কোন ব্যক্তি এসব কথার সবগুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে এবং এগুলোর দাবী অনুযায়ী আমলে সালিহা করবে, কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাকে বলা হবে পরিপূর্ণ মু'মিন ও মুসলিম। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যে, তাকে দুনিয়াতে, বরযখে ও আখিরাতে ইজ্জত ও শান্তির সাথে রাখবেন এবং তাকে সকল প্রকার আযাব-গযব ও কষ্ট-পেরেশানী থেকে হিফাযত করবেন। কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে হিফাযত করে তাকে আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টির সংবাদসহ মহাসুখের আবাস ও আনন্দের স্থান জান্নাত দান করবেন।

আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত কথাগুলোর সবগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস তো করে, কিন্তু অলসতা বা গাফলতির কারণে কথাগুলোর দাবির ওপর আমল করে না বা আংশিকভাবে আমল করে, তাকে শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক বা গুনাহগার মু'মিন বলা হয়। তার গুনাহসমূহকে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে আযবও দিতে পারেন। তবে সে ব্যক্তি তার ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই জান্নাতে যাবে; সরাসরিও যেতে পারে, অথবা তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়সমূহকে অবিশ্বাস করবে, অথবা এগুলো থেকে মাত্র কোন একটি বিষয়কে অবিশ্বাস করবে কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণ

করবে, অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে, কিংবা এগুলোর মধ্যে কোন দোষ বের করবে, তার ঈমান থাকবে না। বরং সে কাফের বলে গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব থেকে মুসলমান থেকে থাকে, তারপরে তার থেকে এ ধরনের অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) বলা হবে, যদিও সে মুসলমান হওয়ার দাবি করে এবং যদিও সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে পড়ে, মাথায় টুপি ও মুখে দাড়ি রাখে রাখে বা হজ্ব-উমরা পালন করে। এসব আমল পরকালে তার কোন কাজে আসবে না। কারণ এ কাজগুলো নেক আমল। আর কেউ নেক আমল করলেই সে মু'মিন গণ্য হয় না। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যামানায় অনেক মুনাফিক অর্থাৎ নিকৃষ্ট কাফির ছিল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে সকল নেক কাজে অংশ গ্রহণ করতো। এমনকি জিহাদেও শরীক হতো। তারপরও তারা মু'মিন বলে গণ্য হয়নি। বস্তুত ঈমান ভিন্ন জিনিস এবং আমল ভিন্ন জিনিস। সহীহ ঈমানের সাথে আমল দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা পৌঁছায়। আর আমল ব্যতীত শুধু ঈমানও ফায়দা দেয় না। কারণ, এমন ঈমানদার, যার নিকট নেক আমল নেই, সেও কোন এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল দুনিয়াতে কিছু ফায়দা পৌঁছালেও যেমন, তার সুনাম হয় বা ব্যবসা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্হ্য ভালো থাকে ইত্যাদি, কিন্তু আখিরাতে ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল কোনই কাজে আসবে না।

এ সকল বিষয় স্পষ্টভাবে জানা থাকা জরুরী। যাতে ফিতনা-ফাসাদের যুগে ঈমান রক্ষা করা সহজ্ব হয়। হাদীস-শরীফে আছে, ফিতনার যামানায় অনেক মানুষ সকালে মু'মিন থাকবে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৩, মুসলিম শরীফ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫] অর্থাৎ লোকেরা ইলমে দ্বীন শিখবে না, হাক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে না; অপরদিকে বদদ্বীনীর সয়লাব ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হবে। এমনিক দ্বীনের নামে কুফর ও শিরকের প্রচার করা হবে; তখন মানুষ না বুঝে কুফরকে দ্বীন মনে করে গ্রহণ করে কাফির হয়ে যাবে। [আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাযত করুন।]

এখন দেখতে হবে, এসব সহীহ আকীদা ও বিশ্বাস মুসলমানগণ কতটুকু ধরে রেখেছে এবং কতটুকুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে সহীহ আকীদাকে বিগড়ে ফেলেছে। এ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহ বর্ণনার আশা রাখি। তবে তার পূর্বে ঈমানের বিবরণ আরো সবিস্তারে উপলব্ধির জন্যে ঈমানের ৭৭ শাখার বর্ণনা করা হচ্ছে।

আল্লাহর দীদার তথা সাক্ষাৎ সম্পর্কে আকীদা

আল্লাহর দীদার বা আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে ইসলামের আকীদা হল, দুনিয়াতে থেকে জাগ্রত অবস্থায় এই চর্মচক্ষুর দ্বারা কেউ আল্লাহকে কখনো দেখতি পারে নি। এবং পারবেও না। তবে বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে গিয়ে আল্লাহর দীদার তথা দর্শন লাভ করবেন। বেহেশতবাসীদের জন্য এটি হবে একটি নেয়ামত এবং বেহেশতের অন্য সকল নেয়ামতের তুলনায় এই নেয়ামত [আল্লাহর দীদার] সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হবে।
উল্লেখ্য যে, স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা যায়। তবে সে দেখাকে দুনিয়ার চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা বলা হয় না। সুতরাং কেউ আল্লাহকে স্বপ্নে দেখলে তা বাস্তবে আল্লাহকে দেখা হবে না।

আরশ-কুরসী সম্পর্কে আকীদা

আরশ অর্থ সিংহাসন। আর কুরসী অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন তাঁর আরশ বা কুরসীও তেমনি শানের হবে। এটাই স্বাভাবিক। সপ্ত আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ ও কুরসী অবস্থিত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ ও কুরসী এত বিশাল ও বড় আকৃতির যে, তা সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহপাক কোন মাখলুকের ন্যায় ওঠাবসা করেন না। এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানেও সীমাবদ্ধ নন। মাখলুকের তথা সৃষ্টিজীবের কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে আল্লাহর কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের তুলনা বা মিল হয়না। তারপরেও তার আরশ ও কুরসী থাকার কী অর্থ-তা অনুধাবন করা, বিশ্লেষন করা মানব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তাই আমাদের এ নিয়ে বিচার বিশ্লেষন করা ঠিক হবে না। আমাদেরকে শুধু আরশ ও কুরসী সম্পর্কে উল্লেখিত আকীদা বিশ্বাসটুকু রাখতে হবে। এর ঊর্ধ্বে আর কিছু কল্পনা করার অধিকার আমাদের নেই।

ইমাম মাহদী (রহ) সম্পর্কে আকীদা

কিয়ামতের ছোট বড় আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর পরিশেষে এমন একটি সময় আসবে, যখন কাফির-মুশরিকদের প্রভাব খুব বেশি হবে।

চতুর্দিকে খ্রিস্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। খায়বার নামক স্থান পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন দুর্দশার সময় মুসলমানগণ তাদের বাদশাহ বানানোর জন্য হযরত মাহদীকে তালাশ করতে থাকবে, এক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক সৎলোক মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ রত অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পেয়ে তাকে চিনে ফেলবেন। এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে তাকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় তাঁর বয়স হবে চল্লিশ বছর। ঐ সময় একটি গায়েবি আওয়াজ আসবে ইনিই আল্লাহর খলীফা –মাহদী।

হযরত ইমাম মাহদীর নাম হবে মুহাম্মদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি হযরত ফাতিমা (রাযি) এর বংশোদ্ভূত অর্থাৎ সায়্যিদ বংশীয় লোক হবেন। মদীনা তাঁর অবস্থান হবে। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরত করবেন। তাঁর দৈহিক গঠন ও আখলাক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ হবে। তিনি নবী হবেন না, তাঁর ওপর ওহীও অবতীর্ণ হবে না। তিনি মুসলমানদের খলীফা হবেন এবং আধিপত্য বিস্তারকারী খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ পরিচালনা করবেন এবং তাদের দখল থেকে শাম, কনষ্টান্টিনোপল [বর্তমান ইস্তাম্বুল] প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন। তাঁর আমলে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। এবং তার আমলেই হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। হযরত ঈসা (আ) এর আগমনের কিছুকাল পরে তিনি ইনতিকাল করবেন।

হযরত ঈসা (আ)এর দুনিয়াতে অবতরণ সম্পর্কে আকীদা

দাজ্জাল ও তার বাহিনী বাইতুল মুক্কাদ্দাসের চারদিকে ঘিরে ফেলবে। মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে একদিন ফজরের নামাযের ইকামত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ) আকাশ থেকে ফেরেশতাদের ওপর ভর করে অবতরণ করবেন। বাইতুল মুক্কাদ্দাসের পূর্বদিকের মিনারার নিকট তিনি অবতরণ করবেন। এবং হযরত মাহদী এই নামাযের ইমামতি করবেন। নামাযের পর হযরত ঈসা (আ) হাতে ছোট একটি বর্শা নিয়ে বের হবেন। তাঁকে দেখেই দাজ্জাল পলায়ন করতে আরম্ভ করবে। হযরত ঈসা (আ) তার পেছনে ছুটবেন এবং বাবে লুদ নামক জায়গায় গিয়ে তাকে নাগালে পেয়ে বর্শার আঘাতে বধ করবেন।

মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) কে আল্লাহ তা'আলা সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেননি। কিংবা ইহুদিরা তাকে শূলিতে চড়িয়েও হত্যা করতে পারেন নি। তিনি আকাশে জীবিত আছেন। তাঁকে আমাদের নবী সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারকের পাশেই দাফন করা হবে। হযরত ঈসা (আ) তখন নবী হিসাবে আগমন করবেন না। বরং তিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হিসেবে এই দুনিয়াতে আগমন করবেন। এবং এই শরী'আত অনুযায়ী তিনি জীবন-যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন।

দাজ্জাল সম্পর্কে আকীদা

দাজ্জাল শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। এটি কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত। আল্লাহ তা'আলা শেষ জামানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। তার এক চোখ টেরা থাকবে, চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে। সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে 'কাফির', সকল মু'মিন সে লেখা পড়তে পারবে, ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার অভ্যুত্থান হবে। সে ইহুদি বংশোদ্ভূত হবে। প্রথমে সে নবুওয়তের দাবি করবে। তারপর ইস্পাহানে যাবে, সেখানে ৭০ হাজার ইহুদি তার অনুগামী হবে। তখন সে খোদায়ী দাবি করবে। লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেখাবে, মৃতকে জীবিত করে দেখাবে, কৃত্রিম বেহেশত দোযখ তার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহশত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশত। সে আরো অনেক অলৌকিক কান্ড দেখাতে পারবে। যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভূক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এক ভীষণ ফেতনা ও ভীষণ পরীক্ষা হবে সেটা। দাজ্জাল একটা গাধার উপর সওয়ার হয়ে ঝড়ের বেগে সমগ্র ভূ-খন্ডে বিচরণ করবে এবং মক্কা, মদীনা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ব্যতীত [এসব এলাকায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। ফেরেশতাগণ এসব এলাকার পাহারায় থাকবেন।] সব স্থানে ফিতনা বিস্তার করবে। হযরত মাহদীর সময় তা আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা (আ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। এবং তারই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। অভ্যুত্থানের পর দাজ্জাল সর্বমোট ৪০ দিন দুনিয়াতে থাকবে। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য হাদীসে নিচের এই দু'আটি পড়তে বলা হয়েছে-

اَ للّٰهُمَّ اِ نِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ ا لدَّجَّا لِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপত্তা চাই। [সূত্র : মিশকাত শরীফ।]

আকাশের এক ধরণের ধোঁয়া সম্পর্কে আকীদা

হযরত ঈসা (আ) এর ইনতিকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে দ্বীনকারী কমে যাবে। চারিদিকে বেদ্বীনি শুরু হয়ে যাবে। এরই মাঝে এক সময় আকাশ থেকে একধরণের ধোঁয়া আসবে। যার ফলে মু'মিন মুসলমানদের সর্দির মতো ভাব হবে। আর কাফিররা বেহুঁশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হবে।

ইয়াজুজ মা'জুজ সম্পর্কে আকীদা

দাজ্জালের ফিতনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়াজুজ মাজুজের ফিতনা। এটাও কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত। ইয়াজুজ মাজুজ অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষগোষ্ঠী। তাদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। ভীষণ উৎপাত শুরু করবে। তারা সর্বত্র হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে। [তারা বর্তমানে কোন দেশের কোথায় কী অবস্থায় অবস্থিত, কী তাদের বর্তমান পরিচয় তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসেও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাদের রাজত্ব ও উৎপাত চলাকালে হযরত ঈসা (আ) এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর হুকুমে তূর পর্বতে আশ্রয় নিবেন। হযরত ঈসা (আ) ও মুসলমানরা তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা মহামারীর আকারে রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করবেন। বর্ণিত আছে-সেই রোগের ফলে তাদের ঘাড়ে এক ধরণের পোকা সৃষ্টি হবে। ফলে অল্প সময়ের মাঝেই ইয়াজুজ-মা'জুজের গোষ্ঠী সকলেই মরে যাবে। তাদের অসংখ্য মৃতদেহের পচা দুর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন হযরত ঈসা (আ) এবং তার সঙ্গীদের দু'আয় আল্লাহ তা'আলা একধরণের বিরাটকার পাখী প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে নিয়ে সাগরে বা যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এবং সমস্ত ভূপৃষ্ঠ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় সম্পর্কে আকীদা

এর কিছু দিন পর একদিন হঠাৎ একটি রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যাক্ত হয়ে যাবে। গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাবে এবং চিৎকার শুরু করবে। তারপর সূর্য সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে। তখন থেকে আর কারো ঈমান বা তাওবা কবুল হবে না। তওবার দরোযা বন্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্ব পর্যন্ত খোলা থাকবে। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আল্লাহর হুকুমে আবার পশ্চিম দিকে গিয়েই অস্ত যাবে। তারপর আবার যথারীতি কিছুদিন পূর্বের নিয়ম মাফিক পূর্বদিক থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে অস্ত যেতে থাকবে। এবং পরিশেষে অস্ত হয়ে যাবে।

দাব্বাতুল আরদ সম্পর্কে আকীদা

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের কিছুদিন পর মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভুত আকৃতির এক জানোয়ার বের হবে। একে বলা হয় দাব্বাতুল আরদ [ভূমির জন্তু]। এটিও কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত। এই প্রাণীটি মানুষের সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলবে। সে অতি দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। সে মু'মিনদের কপালে একটি নূরানি রেখা টেনে দিবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে। এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে। ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে চিনতে পারবে। এই জন্তুর আবিভার্ব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত সমূহের অন্যতম। এই জন্তুটির আকার আকৃতি সম্পর্কে ইবনে কাছীরে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। এসবের অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়।

কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে আকীদা

দাব্বাতুল আরদ গায়েব হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে একটি আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে ঈমানদারগণের বগলে কিছু অসুখ হবে এবং তারা খুব সহজেই মারা যাবে। দুনিয়ায় কোনো ঈমানদার ব্যক্তি ও আল্লাহ আল্লাহ করার বা আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সারা দুনিয়ায় হাবশী কাফিরদের একসঙ্গে রাজত্ব চলবে। তারা বাইতুল্লাহ

শরীফ ধ্বংস করে ফেলবে। কুরআন শরীফ মানুষের অন্তর থেকে এবং কাগজ থেকে উঠে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এবং তখনই কিয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে। সিঙ্গার ফুঁকে প্রথম প্রথম হালকা আওয়াজ হবে। পরে এত বিকট ও ভীষণ হবে যে, সারা দুনিয়ার সমস্ত লোক মারা যাবে। আসমান ও জমিন ফেটে চূর্ন-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। পূর্বে যারা মারা গেছে তাদের রুহুও বেহুঁশ হয়ে যাবে। সর্বশেষ সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

দু'আর মাঝে ওসিলা গ্রহণ প্রসঙ্গে আকীদা

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকদের ওসিলা দিয়ে কিংবা কোন নেক কাজের ওসিলা দিয়ে দু'আ করা জায়িয বরং তা মুস্তাহাব [সূত্র : আহসানুল ফাতাওয়া ১ম খন্ড।]

কারামত, কাশফ, এলহাম ও পীর বুযুর্গ বিষয়ে আকীদা

আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে বুযুর্গ এবং অলী বলা হয়। আর শরী'আতের বরখেলাফ চলে কেউ কখনো আল্লাহর প্রিয় বা অলী বা বুযুর্গ হতে পারে না। অতএব যারা শরী'আত বিরোধী কাজ করে যেমন-নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, গাজা বা নেশা করে, বেগানা মহিলাকে স্পর্শ করে বা দেখে, গান বাদ্য ইত্যাদি করে তারা কখনো পীর বুযুর্গ নয়। তারা যদি অলৌকিক কিছু দেখায় তা হলে সেটা কারামত নয়। বরং বুঝতে হবে সেটা জাদু বা এ ধরণের কিছুটা একটা হয়ে থাকবে। আর জাদু ফাসিকদের থেকেই প্রকাশ হয়।

যেহেতু শয়তান বাতাসে ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমন করতে পারে এ জন্য অনেক সময় শয়তান এসব লোকদের নিকট গায়েব জগতের অনেক খবরাখবর জানিয়ে দেয়। এতে করে এসব শুনে মুর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবেই তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না। এ সকল লোকদের কাছে গেলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।কাশফ ও এলহাম শরী'আতের মুতাবিক হলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কোন বুযুর্গ বা পীর বিষয়ে এই আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময়ে আমাদের অবস্থা জানেন, এটা সম্পূর্ণ শিরক।

কোন পীর, বুযুর্গের হাতে বাইআত হলে তিনি নাজাতের ব্যবস্থা করবেন, পুলসিরাত পার করে দিবেন, এ ধরণের আকীদা রাখাও গুমরাহী বরং পীর বুযুর্গ কেবল ঈমান ও আমলের পথ দেখাবেন। আর এই ঈমান ও আমলই হবে নাজাতের ওসিলা। কোনো পীর বুযুর্গের মর্যাদা চাই সে যত বড় হোক কস্মিনকালেও কোনো নবী বা সাহাবী থেকে বেশি বা তাদের সমানও হতে পারবে না।

ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে আকীদা

ঈসালে সওয়াব অর্থ সওয়াব রেসানী বা সওয়াব পৌঁছানো। মৃত মুসলমানদের নিয়তে আদায়কৃত নামায, রোযা, দান, সদকা, তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ইত্যাদি শারীরিক ও আর্থিক সকল ইবাদতের সওয়াব তাদের রুহে পৌঁছে থাকে। এটা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এক মতে ফরয ইবাদতের দ্বারাও ঈসালে সওয়াব করা যায়। এতে একদিকে নিজের দায়িত্বও আদায় হবে, অপরদিকে মৃতুব্যক্তিও সওয়াব পাবে। [সূত্র : ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খন্ড]

মাজার বিষয়ে আকীদা

মাজার শব্দের অর্থ যিয়ারতের জায়গা। সাধারণভাবে বুযুর্গদের কবর যেখানে যিয়ারত করা হয়, তাকে মাজার বলে। সাধারণভাবে কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয়। যেমন অন্তর নরম হয়, মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, আখিরাতের চিন্তা বাড়ে, ইবাদতে আগ্রহ বাড়ে ইত্যাদি। বিশেষভাবে বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদর রুহানী ফয়েযও লাভ হয়। মাজারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য। কিন্তু এছাড়া সাধারণ মানুষ মাজার ও মাজার যিয়ারত করা বিষয়ে এমন কিছু ভুল আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে যার অনেকটাই শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত। এসব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। যেমন:

মাজার বিষয়ে ভুল আকীদা

মাজারে গেলে বিপদাপদ দূর হয়।
মাজার তওয়াফ করলে সওয়াব হয়।

মাজারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়।
মাজারে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ হয়।
মাজারে গেলে মাকসুদ হাসিল হয়।
মাজারে টাকা পয়সা নজর-নিয়াজ দিলে ফায়দা হয়।
মাজারে গিয়ে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়।
মাজারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেওয়াকে সওয়াবের কাজ মনে করা।
মাজারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

বস্তুর ক্ষমতা সম্পর্কে আকীদা

কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা আছে এমন বিশ্বাস করাও শিরক। তবে বস্তুর মাঝে যে ক্ষমতা দেখা যায় বা বস্তু থেকে যে প্রভাব প্রকাশ পায়, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত। তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে বা কখনো সাময়িকভাবে ক্ষমতা হরণ করে নিলে এর স্বাভাবিক কার্যকারিতাও প্রকাশ পাবে না। আল্লাহপাকের এরূপ ফায়সালা হলেই বস্তুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রকাশ পায় না। বস্তু বিষয়ে এ হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা।

অলী, আবদাল, গাওস ও কুতুব বিষয়ে আকীদা

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন, মানব জগতে বার প্রকার অলী-আওলিয়া রয়েছে। তারা হল-

১. কুতুব : তাকে কুতুবুল আলম কুতুবুল আকবার, কুতুবুল ইরশাদ ও কুতুবুল আকতাবও বলা হয়। আলমে গায়েবের মধ্যে এ কুতুবুকে আবদুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তার দুজন উযীর থাকেন। যাদেরকে ইমামাইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম আবদুল মালিক। বামের উযীরের নাম আবদুর রব। এছাড়া আরো বার জন কুতুব থাকেন, সাত জন সাত একলীমে থাকেন, তাদেরকে কুতুবে একলীম বলা হয়। আর পাঁচ জন ইয়েমেনে থাকেন, তাদেরকে কুতুবে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতীত অনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে থাকেন এক একজন করে।

২. ইমামাইন : ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৩. গাওস : গাওস মাত্র একজন থাকেন। কেউ কেউ বলেছেন, কুতুবকেই গাওস বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, কুতুব আর গাওস এক নয়। গাওস ভিন্ন। তিনি মক্কা শরীফে থাকেন।

৪. আওতাদ : আওতাদ চারজন। পৃথিবীর চার কোনে চার জন থাকেন।

৫. আবদাল : আবদাল থাকেন চল্লিশ জন।

৬. আখয়ার : তারা থাকেন পাঁচশ জন কিংবা সাতশ জন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা ভ্রমণ করতে থাকেন।

৭. আবরার : অধিকাংশ বুযুর্গানেদ্বীন আবদালগণকেই আবরার বলেছেন।

৮. নুকাবা : নুকাবা আলী নামে ৩০০ জন পশ্চিম দেশে থাকেন।

৯. নুজাবা : নুজাবা হাসান নামে ৭০ জন মিসরে থাকেন।

১০. আমূদ : আমূদ মুহাম্মদ নামে চারজন পৃথিবীর চার কোণে থাকেন।

১১. মুফাররিদ : গাওসই উন্নতি করে ফারদ বা মুফাররিদ হয়ে যান। আর ফারদ উন্নতি করে কুতুবুল আহদাত হয়ে যান।

১২. মাকতুম : মাকতুম শব্দের অর্থ লুকায়িত। অর্থ যেমন তারাও তেমনি লুকায়িত থাকেন।

উল্লেখ্য, অলীদের এই প্রকার এবং এই বিবরণ সম্পর্কে হাদীসে খুলে কিছু বলা হয়নি, শুধু বুযুর্গানেদ্বীনের কাশফ দ্বারা এটা জানা গেছে। আর কাশফ যার হয় তার জন্য সেটা দলিল। অন্যদের জন্য সেটা দলিল নয়। অতএব এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা তর্কবির্তক করা ঠিক নয়।

রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

রাশি হল সৌর জগতের কতগুলো গ্রহণক্ষত্রের প্রতীক। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয়। যথা- মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র [অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology এর ধারণা অনুযায়ী এসব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ সংঘঠিত হতে পারে। এভাবেই শুভ অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন:

قُل إِنّى عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبّى وَكَذَّبتُم بِهِ ۚ ما عِندى ما تَستَعجِلونَ بِهِ ۚ إِنِ الحُكمُ إِلّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيرُ الفٰصِلينَ (৫৭)

নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। [সূরা-আনআম,আয়াত-৫৭]

সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে, এই আকীদা রাখা শিরক। তবে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোনো প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। যদি প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোনো প্রভাব থাকেও তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব, শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও তারই নিয়ন্ত্রণে। [সূত্র : ফাতহুল মুলহিম।]

রোগ সংক্রমণ বিষয়ে আকীদা

জনসমাজে ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে, সে সম্পর্কে ইসলামের আকীদা হল, কোন রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তাই দেখা যায়, তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরও অনেকে আক্রান্ত হয় না, তাছাড়া ডাক্তাররা তাদের সেবায় নিয়োজিত থেকেও তাদের অনেকের রোগ হয় না। আবার অনেকে না যেয়েও আক্রান্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে সহীহ আকীদা হল, রোগের মাঝে সংক্রমণ বা অন্যের মাঝে বিস্তৃত হওয়ার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কেউ অনুরূপ রোগীর সংস্পর্শে গেলে যদি তার আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা হয়, সে ক্ষেত্রেই কেবল সে আল্লাহর হুকুমে আক্রান্ত হবে, অন্যথায় নয়। কিংবা এরূপ আকীদা রাখতে হবে, এসব রোগের মাঝে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ তা'আলা সংক্রমণের এই নিয়ম রেখে দিয়েছেন। তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে সংক্রমণ নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ সংক্রমনের এই ক্ষমতা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চাতে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা এবং তার ইচ্ছার দখল থাকে। তবে ইসলাম প্রচলিত এসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগীর নিকট, এ কারণে যে, উক্ত রোগীর নিকটে গেলে আর তার আক্রান্ত হওয়ার খোদায়ী ফায়সালা হওয়ার কারণে সে আক্রান্ত হলে তার ধারণা হতে পারে যে, উক্ত রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে, এভাবে

তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন হতে না পারে, এজন্যই ইসলাম এরূপ বিধান দিয়েছে। তবে কেউ মজবুত আকীদার অধিকারী হলে, সে অনুরূপ রোগীর নিকট যেতে পারে। এমনিভাবে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোককেও সুস্থ এলাকার লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে। যাতে তা অন্য কারো আকীদা নষ্টের কারণ না ঘটে।

রত্ন ও পাথরের প্রভাব বিষয়ে আকীদা

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে–এরূপ আকীদা বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের নয়।
[সূত্র : আপকে মাসাইল আওর উনকে হল।]

হস্ত রেখা বিচার বিষয়ে আকীদা

পামিষ্ট্রি (Pamistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয়ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী।
[সূত্র:আপকে মাসাইল আওর উনকে হল, প্রথম খন্ড।]

নজর ও বাতাস লাগার বিষয়ে আকীদা

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নজর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে গেলে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনজর লাগতে পারে। এমনকি সন্তানের প্রতিও মা-বাবার বদনজর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন-ভূতের বাতাস অর্থাৎ তাদের খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তা হলে এটাও সত্য। কেননা, জিন-ভূত মানুষের ওপর আছর করতে সক্ষম।

কেউ কারো কোন ভালো কিছু দেখলে যদি মাশাআল্লাহ বলে তা হলে তার প্রতি বদনজর লাগে না। আর কারো ওপর কারো বদনজর লেগে গেলে যার নজর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ হাত [কনুইসহ] হাঁটু এবং ইসতিনজার জায়গা ধুয়ে সেই পানি যার ওপর নজর লেগেছে তার ওপর ঢেলে দিলে আল্লাহ চাহে তো ভালো হয়ে যাবে। বদনজর থেকে হিফাযতের জন্য কাল সূতা বাঁধা বা কালি কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন এবং কুসংস্কার।

কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ বিষয়ে আকীদা

ইসলামী আকীদা মতে কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে কু-লক্ষণ গ্রহণ করা বা কোন সময়, দিন ও মাসকে খারাপ মনে করা বৈধ নয়। এমনিভাবে কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়-এমন কোন লক্ষণ মানাও বৈধ নয়। তবে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় রয়েছে, এরূপ মুহুর্তে ঘটনাক্রমে বা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি বা সাফল্যসূচক কোন শব্দ শ্রুতিগোচর কিংবা দৃষ্টিগোচর হলে সেটাকে সু-লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এটা মূলতঃ কোন শব্দ বা বস্তুর প্রভাবকে বিশ্বাস করা নয়-এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমতের আশাকে শক্তিশালী করে।

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে আকীদা

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়-হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন দু'আ করা হলে রোগ ব্যাধি আরোগ্য হতেও পারে নাও হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মর্জি হলে আরোগ্য লাভ হবে, তা না হলে নয়। এমনিভাবে তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকও একটি দু'আ। মনে রাখতে হবে তাবীজের চেয়ে কিন্তু দু'আ আরো বেশি শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই তা হয়ে থাকে।

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই ইজতিহাদ এবং কুরআন থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীসে যার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাজ হবে। অতএব, কোনো তাবীজ বা কোন ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে এরূপ বলার বা এমন ভাবার অবকাশ নেই যে, কুরআন ও হাদীস কি তা হলে সত্য নয়?

যেসব বাক্য বা শব্দ কিংবা যেসব-নকশার অর্থ জানা যায় না, তার দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে-এমন মনে করা ঠিক নয়।

তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারো অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক-এমন ধারণা করাও ভুল।

তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভালো আছর হলে সেটাকে তাবীজদাতার বা আমিলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। [সূত্র: ফাতাওয়া শামী।]

ফাতিহা ইয়াযদাহম

ফাতিহা বলতে বোঝানো হয়, কোন মৃতের জন্য দু'আ করা, ঈসালে সওয়াব করা। ইয়াযদহম ফার্সি শব্দটির অর্থ একাদশ। ৫৬১ হিজরী মুতাবিক ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ রবীউস সানী তারিখে বড়পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রহ) ইনতেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রবীউস সানীর ১১ তারিখে যে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, উরস ও ফাতিহাখানী করা হয় তাকে বলা হয় ফাতিহা ইয়াযদহম।

পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও উরস করা শরী'আত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়। তবে তিনি অনেক উঁচু দরের অলী ও বুযুর্গ ছিলেন। তাই এই নির্দিষ্ট তারিখের অনুসরণ না করে অন্য যে কোন দিন তাঁর জন্য দু'আ করলে এবং জায়িয তরীকায় তাঁর জন্য ঈসালে সওয়াব করলে তাঁর রুহানী ফয়েজ ও বরকত লাভের ওসীলা হবে এবং তা সওয়াবের কাজ হবে।

আখেরী চাহার শোমবাহ

আখেরী চাহার শোমবাহ কথাটি ফার্সি। এর অর্থ শেষ বুধবার। সাধারণ পরিভাষায় আখেরী চাহার শোমবাহ বলে সফর মাসের শেষ বুধবারকে বোঝানো হয়ে থাকে। বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থতার মধ্যে রবীউল আওয়াল মাসের শুরু ভাগে ইনতিকাল করেন, সে অসুস্থতা থেকে সফর মাসের শেষ বুধবারে অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবায় কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন, তাই এ দিবসটিকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। অথচ এ তথ্য সহীহ নয় বরং ও বিশুদ্ধ তথ্য হল, এ বুধবারেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। কাজেই যে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা বেড়ে যায়, সেদিন ইহুদী প্রমুখদের জন্য খুশির দিন হতে পারে, মুসলমানদের জন্য নয়। অতএব, সফর মাসের শেষ বুধবার অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবাহকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা এবং ঐ দিন ছুটি পালন করা জায়িয হবে না।

[সূত্র : ফাতাওয়া রাহীমিয়া, খন্ড ১]

শরী'আতের আকীদাবিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কু-লক্ষণের তালিকা

১. হাতের তালু চুলকালে অর্থকড়ি আসবে মনে করা।

২. চোখ লাফালে বিপদ আসবে মনে করা।

৩. কুত্তা কান্নাকাটি করলে রোগ বা মহামারী আসবে মনে করা।

৪. এক চিরুনিতে দু জন চুল আঁচড়ালে এই দু জনের মাঝে ঝগড়া লাগবে মনে করা।

৫. কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা।

৬. যাত্রাপথে পেছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা খারাপ হবে মনে করা।

৭. যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেয়র দেখলে বা কাল কলসি দেখলে কিংবা বিড়াল দেখলে-কু-লক্ষণ মনে করা। অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিন ভ্রমণ নাস্তি ইত্যাদি বিশ্বাস করা। মোটকথা কোন দিন বা কোন মুহূর্তকে অশুভ মনে করা।

৮. যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না-এমন বিশ্বাস করা।

৯. পেঁচা ডাকলে ঘরবাড়ি বিরান হয়ে যাবে মনে করা।

১০. জিহবায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে মনে করা।

১১. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা।

১২. দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা।

১৩. কোনো লোকের আলোচনা চলছে, এই ফাঁকে বা এর কিছুদিন পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবী হওয়ার লক্ষণ মনে করা।

১৪. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে সেই ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে মনে করা।

১৫. আসরের পর ঘর ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।

১৬. ঝাড়ু দ্বারা বিছানা পরিস্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা।

১৭. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চা মারা যাবে মনে করা।

১৮. ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা।
১৯. কোন প্রাণী বা প্রাণীর ডাককে অশুভ বা অশুভ লক্ষণ মনে করা।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ ধরণের আরো অনেক ভুল বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সেসব থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে বাছাই করে উল্লেখ করা হল। এসব নেয়া হয়েছে "আগলাতুল আওয়াম" গ্রন্থ থেকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিষয়ে আকীদা :

এই হাদীসে বলা হয়েছে, অতি শীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তুর ফেরকায় [দলে] বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত। অর্থাৎ এরা হবে জান্নাতী। আর বাকি সবগুলো ফেরকা হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর আছি তার অনুসারীগণ। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড।]
এই হাদীসের মধ্যে যে মুক্তিপ্রাপ্ত বা জান্নাতী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদেরকে বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। নামটির মাঝে সুন্নাত শব্দ দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত ও পথ এবং জামাত শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের জামাত উদ্দেশ্য। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথের অনুসারীদেরকে বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যেসব সম্প্রদায় ও ফেরকার উদ্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বযুগে এই দলটিই হল সত্যাশ্রয়ী দল। সর্বযুগে ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে হকপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম এভাবে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথের অনুসরণ করে আসছেন। এ দলটি তারই অনুসরণ করে আসছে। সর্বযুগে এই দলই হচ্ছে বড় দল। সর্বযুগেই এরা টিকে আছে। এর বাইরে যারা গিয়েছে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বহির্ভূত বিপথগামী ও বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এ ধরণের অনেক বাতিল সম্প্রদায় কালের অতল তলে বিলীন হয়ে গেছে। যারা রয়েছে এখনো, তারাও অচিরেই বিলীন হবে। হকপন্থী দল চিরকালই টিকে থাকবে।

ঈমান সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে মনে সন্দেহে জাগলে তখন করণীয় কী?

যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, সেসব বিষয়ে যদি কখনো মনে সন্দেহ হয় এবং ওয়াসওয়াসা দেখা দেয়, যেমন মনে সন্দেহ দেখা দিল যে,[নাউযুবিল্লাহ] আসলে আল্লাহ বলে কেউ আছেন কি! কিংবা সন্দেহ দেখা দিল যে, জান্নাত জাহান্নাম আসলে আছে কি? এভাবে আল্লাহ ও রাসূল কুরআন, পরকাল, তকদীর ইত্যাদি ঈমান সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে মনে সন্দেহে আসলে তখন তিনটা আমল করণীয়। যথাঃ-

১. আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়ে নেয়া।

২. আমানতু বিল্লাহ অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম পড়ে নেয়া।

৩. উক্ত চিন্তা থেকে বিরত হয়ে অন্য কোন চিন্তা বা কাজে লিপ্ত হওয়া।

ঈমান শক্তিশালী বা দুর্বল হয় কিভাবে

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্বারা ঈমান শক্তিশালী অর্থাৎ ঈমানের মধ্যে নূর পয়দা হয় এবং তা মজবুত হয়।

১. ঈমানের আলোচনা দ্বারা।

২. ঈমানদারদের সাহচর্য দ্বারা।

৩. আমল দ্বারা। [ঈমানের শাখাগুলোর ওপর আমল দ্বারা]

পক্ষান্তরে ঈমান দূর্বল হয়ে যায় এবং ঈমানের নূর কমে যায় এমনকি কখনো কখনো ঈমান নষ্ট পর্যন্ত হয়ে যায় নিচে বর্ণিত কারণে।

১. কুফর দ্বারা

২. শিরক দ্বারা

৩. বিদ‘আত দ্বারা

৪. কু-সংস্কার ও কু-প্রথা পালন করার দ্বারা।

৫. গুনাহ করার দ্বারা

(ইয়ানাতে আহকামে যিন্দেগী)

পৃষ্ঠা-৪৫

অধ্যায় দুই
ঈমানের সাতাত্তুর শাখা

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যখন কোন সূরাহ অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরাহ তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? বস্তুত যারা ঈমানদার, এ সূরাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। [সূত্র : সূরাহ তাওবা, আয়াত ১২৪।]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

যখন তাদের নিকট কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। [সূত্র : সূরাহ আনফাল, আয়াত–২।]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায়, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত, তা মমার্থ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি অগ্রগতি ঘটে; অর্থাৎ ঈমানের নূর, আস্বাদ ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হযরত আলী (রাযি) বলেন : যখন ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি শ্বেত বিন্দুর মতো দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেত বিন্দু ততই সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। [সূত্র : তাফসীরে মাযহারী, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৬. মা'আরিফুল কুরআন, খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪৯৪।]

হযরত আবু হুরাইয়া (রাযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, ঈমানের সত্তরের ওপর শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো, (দিলের বিশ্বাসের সাথে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা।

[সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড ১, পৃষ্টা ৪৭]

ঈমান ও ইসলাম কতগুলো কার্যের সমষ্টির নাম। সেই কার্যাবলীর মধ্যে কতগুলো দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কতগুলো জবান দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং কতকগুলো শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মোট কার্য ৭৭টি। তন্মধ্যে দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০টি, জবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭টি এবং হাত-পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০টি। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৩০টি কাজ-যা দিলের দ্বারা সমাধা হয়

১. আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনয়ন করা

আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের অর্থ শুধু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়, বরং অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব, নিরাকার, তা স্বীকর করা, তাঁর সিফাত অথাৎ মহৎ গুনাবলী স্বীকার করা এবং তিনি যে এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান ও দয়াময় এটাও স্বীকার করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়-এ কথাও বিশ্বাস করা কর্তব্য।

২. সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট-এর ওপর ঈমান রাখা

মুসলমানগণের অকাট্য বিশ্বাস ও ঈমান রাখতে হবে যে, ভালো-মন্দ ছোট-বড় সমস্ত বিষয় ও বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

৩. ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান

ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা। কোন কাজেই তাঁরা বিন্দুমাত্র নাফরমানী করেন না এবং তাঁদের আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতাও অনেক বেশি। আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অনেক যিম্মাদারী অপর্ণ করেছেন।

৪. **আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখা :**

পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে এরূপ ঈমান রাখতে হবে, এ মহান কিতাবটি কোন মানুষের রচিত নয়; বরং তা আদ্যোপান্ত আল্লাহ তা'আলার কালাম বা বাণী। পবিত্র কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অকাট্য সত্য। এত দ্বিন্ন পূর্ববর্তী

নবীগণের প্রতি সেসব ছোট-বড় কিতাব নাযিল হয়েছিল, সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও অকাট্য ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে লোকেরা ঐ সব বিকৃত ও পরিবর্তন করে ফেলেছে। কিন্তু কুরআন শরীফকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রূপে সংরক্ষণ করার ভার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। সেই হিসেবে পবিত্র কুরআন অবিকল নাযিলকৃত অবস্থায়ই বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।

৫. পয়গাম্বরগণ সম্বন্ধে ঈমান রাখা

বিশ্বাস রাখতে হবে, নবী বা পয়গাম্বর বহুসংখ্যক ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ও বেগুনাহ ছিলেন। তাঁরা স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে গেছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর আনীত শরী'আতই আমাদের পালনীয়।

৬. আখিরাত সম্বন্ধে ঈমান রাখা

আখিরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ হলো, কবরের সওয়াল-জওয়াব ও সওয়াল-আযাব বিশ্বাস করা, হাশরের ময়দানে আদি হতে অন্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সকল মানুষ একত্রিত হবে, নেকী-বদী পরিমাপ করা হবে ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ কিয়ামত সম্বন্ধে যত কথা কুরআন ও হাদীস শরীফে এসেছে, সব বিশ্বাস করা জরুরী।

৭. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান রাখা

তাকদীর সম্বন্ধে কখনো তর্ক-বির্তক করবে না, বা মনে সংশয়-সন্দেহ স্থান দিবে না। দুনিয়াতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, সবই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন ও হুকুমের তাবেদার। আল্লাহপাকের ক্ষমতায়ই সবকিছু হয়। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও কাজের ইখতিয়ার দিয়েছেন। মানুষ নিজের ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় ভালো-মন্দ যা কিছু করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন।

৮. বেহেশতের ওপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বেহেশতের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহপাক নেককার মু'মিন বান্দাদেরকে বেহেশতে তাদের আমলের যথার্থ প্রতিদান ও পুরস্কার দিবেন। তারা ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে চিরকাল বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত ও শান্তি ভোগ করবেন। বেহেশতের বাস্তবতা সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে।

৯. দোযখের ওপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে দোযখের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহপাক কাফির, ফাসিক-ফাজির ও বদককারদেরকে জাহান্নাম বা দোযখে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত পরিণাম বা শাস্তি দিবেন। কাফিররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আর গুনাহগার ঈমানদাররা জাহান্নামে নির্দিষ্ট মেয়াদের শাস্তি ভোগের পর ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে যাবে। দোযখের বাস্তবতার ওপর ঈমান রাখতে হবে।

১০. অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত রাখা

অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি সবর্দা মুহাব্বত বদ্ধমূল রাখতে হবে। এমনকি দুনিয়ার সবকিছু থেকে আল্লাহপাকের মুহাব্বত বেশি হতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন-

وَا لَّذِ يْنَ ا مَنُوْا اشَدُّ حُبًّا للّٰهِ

যারা মু'মিন, আল্লাহর প্রতি তাদের মুহাব্বত সর্বাধিক প্রকট।

১১. আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে দোস্তি ও দুশমনি রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের মধুরতা, প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে-

ক. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক মুহাব্বত করবে।

খ. কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে মুহাব্বত করতে হলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য করবে না।

গ. কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মন্দ জানতে হলে, শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই মন্দ জানবে।

[সূত্র: মুসনাদে আহমাদ। খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৩, ১৭৪, ২৩০, ২৪৮, ২৮৮।]

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুহাব্বত রাখা, সুন্নাতকে ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মুহাব্বত রাখা ঈমানের বিশেষ শাখা। এর অর্থ শুধু মুহাব্বতের দাবি করা বা নাত-গযল পড়া নয়, বরং এর সংশ্লিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হবে। যথা-

১. অন্তরের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভক্তি করতে হবে।

২. বাহ্যিকভাবে তাঁর আদব-তাযীম রক্ষা করতে হবে।

৩. রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দুরুদ ও সালাম পড়তে হবে।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তরীকার পায়রবি করতে হবে।

১৩. ইখলাসের সাথে আমল করা

যে কোন নেক কাজ খালিসভাবে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার নিয়তে করা ঈমানের দাবি। নিয়ত খালিস হবে, মুনাফিকী ও রিয়া থাকতে পারবে না। মু'মিনের সকল কাজ একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই হতে হবে।

১৪. গুনাহ থেকে তাওবা করা

তাওবা শুধু গঁদবাধা কতগুলো শব্দ উচ্চারণের নাম নয়; বরং গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে তাথেকে সম্পূর্ণরূপে পরহেয করা জরুরী। এক বুযুর্গ আরবীতে অতিসংক্ষেপে তাওবার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-

التوبة تحرق الحشا على الخطأ

গুনাহের কারণে মনের ভিতর অনুতাপের আগুন জ্বলাকেই তাওবা বলে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি) বলেন-রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: الندم توبة অনুতাপের নামই তাওবা। সূত্র : [মুসানাদে আহমাদ খন্ড-১, পৃষ্ঠা -৩৭৬, ৪২৩, ৪৩৩।]

১৫. অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা

হযরত মু'আয (রাযি) হতে রিওয়ায়েত আছে যে, ঈমানওয়ালার দিল কখনো খোদার ভয় ছাড়া থাকে না, সবসময়ই তা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকে। কোন সময়ই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

[সূত্র: হিলইয়াতুল আউলিয়া।]

১৬. আল্লাহপাকের রহমতের আশা করা

কুরআন শরীফে আছে, যারা কাফির, তারাই শুধু আল্লাহপাকের রহমত হতে নিরাশ হয়। আল্লাহর রহমতের আশা রাখা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

১৭. লজ্জাশীলতা বজায় রাখা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَيَا ءُشُعْبَةٌمِّنَ اِلايْمَانِ

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বড় শাখা।

[সূত্রঃ বুখারী খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৬ ও মুসলিম খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৪৭।]

১৮. শুকরগুযার হওয়া

শুকর দুই প্রকার।

ক. আল্লাহর শুকর আদায় করা, যিনি প্রকৃত দাতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার শুকর করো, নাশুকরি করো না।

খ. মানুষের শুকর আদায় করা। অর্থাৎ যাদের হাতের মাধ্যম আল্লাহপাকের নেয়ামত পাওয়া যায়, তাদের শুকর করা। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকর আদায় করলো না, সে আল্লাহর শুকর করলো না।

১৯. অঙ্গীকার রক্ষা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকার পূর্ণ করো। অর্থাৎ কাউকে কোন কথা দিয়ে থাকলে তা রক্ষা করো। [সূত্রঃ সূরাহ মায়িদা ১]

২০. সবর বা ধৈর্য ধারণ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা সবর করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে (সহায়) আছেন।

২১. তাওয়াযু বা নম্রতা অবলম্বন করা

নম্রতা অর্থ নিজেকে নিজে অন্তর থেকে সকলের তুলনায় ছোট মনে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। [সূত্র : হিলয়াতুল আওলিয়া খন্ড–৭, পৃষ্ঠা–১২৯, মিশকাত–৪৩৪।]

২২. দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল হওয়া

হযরত আবু হুরাইয়া (রাযি) রিওয়ায়েত করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুভার্গা, তার থেকেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়।

[সূত্রঃ মূসনাদে আহমাদ খন্ড–২, পৃষ্ঠা ৩০১ ও তিরমিযী শরীফ খন্ড–২, পৃষ্ঠা–১৪।]

২৩. তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকাকে 'রিয়া বিল কাযা' বলে, মহান আল্লাহর সকল ফয়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা। আল্লাহর হুকুমে বিপদ-আপদ বা দুঃখ-কষ্ট আসলে অসন্তুষ্ট না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মনে কষ্ট লাগতে দিবে না, পেরেশানও হবে না। কেননা,কষ্টের বিষয়ে কষ্ট লাগাই তো স্বাভাবিক। তবে আসল কথা হচ্ছে, কষ্ট লাগলেও বুদ্ধির দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা তার মধ্যে কল্যাণ আছে এবং এটা আল্লাহপাকেরই হুকুমে হয়েছে মনে করে সেটাকে পছন্দ করবে। কষ্টকে মনে স্থান দিবে না।

২৪. তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَ كَّلِ الْمُوْ مِنُوْنَ

যাদের ঈমান আছে, তাদের শুধু আল্লাহ তা'আলারই ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা উচিত।

২৫. অহংকার না করা

অহংকার না করা অর্থাৎ অন্যের তুলনায় নিজেকে নিজে ভালো এবং বড় মনে না করা ঈমানের অঙ্গ। তাবারানী নামক হাদীসের কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত আছে-

তিনটি জিনিস মানুষের জন্যে সর্বনাশকারী-

ক. লোভ-যে লোভকে না সামলিয়ে বরং মানুষ তার অনুগত হয়।
খ. নফসানী খায়েশ-যে নফসানী খায়েশকে দমন না করে বরং তার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হয়।
গ. অহংকার-তাকাব্বুর বা অন্যের তুলনায় নিজেকে ভালো ও বড় মন করে।

[সূত্র : তাবারানী আউসাতঃ খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-৪৮৬, হিলয়াঃ খন্ড ৩,-পৃষ্ঠা-২১৯।]

২৬. চোগলখুরী, কীনা ও মনোমালিন্য বর্জন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, চোগলখুরী ও কীনা মানুষকে দোযখে নিয়ে ফেলে। অতএব, কোন মু'মিনের দিলেই এ গর্হিত খাসলত থাকা উচিত নয়।

[সূত্র : তাবারানী, আউসাত খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১২৫ হাদীস (৪৬৫৩)]

২৭. হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা

রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্ম করে ফেলে, তদ্রুপ হিংসা মানুষের নেকীকে ভস্ম করে ফেলে। অতএব খবরদার! খবরদার! তোমরা কখনো হিংসা-বিদ্বেষ করবে না। [সূত্রঃ ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা -৩১০]

২৮. ক্রোধ দমন করা

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ক্রোধ দমনকারীদের প্রশংসা করেছেন। অনর্থক রাগ করা গুনাহ। রাগ-ক্রোধ দমনে হাদীসে তাকীদ এসেছে। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আয়াত আসলে, সেখানে ক্রোধ ও অসুন্তুষ্টি প্রদর্শনই ঈমানের দাবি।

২৯. অন্যের অনিষ্ট সাধন ও প্রতারণা না করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে অন্যের ক্ষতি করে অর্থাৎ পরের মন্দ চায়, অপরকে ঠকায়, ধোঁকা দেয়, তার সাথে কোন সংশ্রবই নেই। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০]

৩০. দুনিয়ার অত্যধিক মায়া-মুহাব্বত ত্যাগ করা

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে, তার আখিরাতের লোকসান হবে এবং যে আখিরাতকে ভালবাসবে, তার দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হবে। হে আমার উম্মতগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ভালোবেসে চিরস্থায়ী আখিরাতকে নষ্ট করে দিও না। তোমরা সকলেই চিরস্থায়ী পরকালকেই শক্তভাবে ধর এবং বেশি করে ভালবাসো। অর্থাৎ দুনিয়ার মুহাব্বত পরিত্যাগ করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে আমলের প্রতি যথাযথ ধাবিত হও। [সূত্র : মুসনাদে আহমদ খন্ড-৪, পৃষ্ঠা -৪১২ ও বাইহাকী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭০।]

ঈমান সংশ্লিষ্ট সাতটি কাজ-যা জবানের দ্বারা সমাধা হয়

৩১. কালিমা পড়া

কালিমার অর্থ-আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বান্দার অঙ্গীকারের কথা দিলে বিশ্বাস করার সাথে সাথে মুখে স্বীকার করা। ইমাম আহমদ (রহ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ঈমান তাজা করতে থাকবে। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান তাজা করতে হবে কেমন করে? হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, খুব বেশি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমা পড়তে থাকবে। [সূত্র : আহমদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা -৩৫৯।]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা (রাযি) হতে রিওয়ায়েত আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত (মুমূর্ষ) লোকদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমার তালকীন দাও। [সূত্র :মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৩০০।] এতদ্ব্যতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমার ফযীলত সম্বন্ধে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানের পাশাপাশি মুখে তার প্রকাশই রয়েছে কালিমার ভিতর।

৩২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন শরীফ তিলায়াত করতে থাক। কেননা, যারা কুরআন শরীফ তিলায়াত করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন স্বয়ং কুরআন শরীফ তাদের জন্য শাফা'আত করবে। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০।]

৩৩. দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যার ভালো করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের ইলম ও কুরআনী জ্ঞান দান করেন। [সূত্রঃ বুখারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬ ও মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৩।]

তিনি আরো বলেছেন, ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।
[সূত্র : ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২০]

আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকার কারণে এবং উসতাদের কাছে হাদীস না পড়ার দরুন অনেকে এই হাদীসের দ্বারা আধুনিক বিদ্যার নামে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞানের নামে জড়জগতের জ্ঞান লাভের অর্থ বুঝে এবং বুঝিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা। এখানে ইলম দ্বারা একমাত্র দ্বীনের জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

৩৪. দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, কারো নিকট কোন ইলমের কথা জিজ্ঞেস করা হলে অর্থাৎ শিক্ষাপ্রার্থী হলে, সে জানা সত্ত্বেও যদি তা প্রকাশ না করে অর্থাৎ শিক্ষা না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে (শাস্তি) দিবেন।
[সূত্রঃ আবু দাউদ খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১৫ ও তিরমিযী শরীফ, খন্ড -২, পৃষ্ঠা-৯৩।]

অন্য হাদীসে এসেছে, দ্বীন শিক্ষা দানকারীর জন্য আসমান ও জমিনের সকল মাখলুক দু'আ করতে থাকে। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৯৭ ও মিশকাত শরীফ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪।]
তাই আল্লাহপাক যাকে দ্বীনি ইলম দান করে সৌভাগ্যমন্ডিত করেছেন, তার কর্তব্য হচ্ছে, অন্যকে সেই ইলম শিখানো।

৩৫. আল্লাহর নিকট দু'আ বা প্রার্থনা করা

হযরত আনাস (রাযি) রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, দু'আ ইবাদতের মগজ।
[সূত্র: তিরমীযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৫।]
রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ফরমায়েছেন, আল্লাহর নিকট দু'আ চাওয়ার মতো মূল্যবান জিনিস আর নেই। অর্থাৎ বান্দা যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা বড়ই সন্তুষ্ট হন।
[সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা -১৭৫।]
তাই আল্লাহপাকের কাছে দু'আ করতে হবে। হাজত চাইতে হবে।

৩৬. আল্লাহর যিকির করা

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি) রিওয়ায়েত করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়ছেন, যে আল্লাহর যিকির করে, সে জীবিতের ন্যায় এবং যে, যিকির করে না, সে মৃততুল্য। [সূত্র : বুখারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৪৮ ও মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৫।]
রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, বিভিন্ন জিনিসের ময়লা দূর করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও যন্ত্র আছে; দিলের মলিনতা দূর করার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে আল্লাহর যিকির।
[সূত্র: বাইহাকীম শু'আবুল ঈমান খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯৬।]

৩৭. বেহুদা কথা হতে জবানকে রক্ষা করা

হযরত সাহল বিন সা'দ (রাযি) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, আমার জন্য যে ব্যক্তি দু'টি জিনিসের যিম্মাদার বা জামিন হবে-এক যা তার ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝে আছে অর্থাৎ জিহবা, দুই যা তার উরুদ্বয়ের মাঝে আছে অর্থাৎ লজ্জাস্থান, আমি তার জন্যে বেহেশতের যামিন ও যিম্মাদার হবো।
[সূত্র : বুখারী শরীফ খন্ড-২, পৃষ্ঠা -৯৫৮-৯৫৯।]

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৪০ টি কাজ যা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সমাধা হয়

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ঈমানের মোট ৪০টি কার্য সমাধা হয়। তন্মধ্যে ১৬টি কাজ নিজেই করতে হয়।

৬টি নিজের লোকদের সঙ্গে করতে হয়।

এবং ১৮টি অন্যান্য জনসাধারণের সাথে করতে হয়। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৬ টি কাজ যা- নিজে নিজেই করতে হয়

৩৮. পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তাহারাত (পাক-সাফ থাকা) ঈমানের অর্ধেক।

[সূত্র: মুসলিম, শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৮।]

৩৯. **নামায কায়িম করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের ছেলেমেয়েদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার জন্যে আদেশ করো। দশ বছর হলে যদি তারা নামায না পড়ে, তাহলে তাদেরকে হাতের দ্বারা শাস্তি দিয়ে নামায পড়াও। আর তাদের শয়নের বিছানা পৃথক করে দাও, অর্থাৎ যখন তাদের কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি হয়, তখন তাদের পৃথক বিছনায় শুতে দাও।

[সূত্র: আবু দাউদ শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০।]

নামায পড়ায় প্রভূত ফযীলত ও সওয়াব এবং নামায তরক করায় কঠিন শাস্তি ও আযাব সম্বন্ধে কুরআনের বহু আয়াত এবং প্রচুর হাদীসের বর্ণনা এসেছে।

৪০. **যাকাত দেয়া**

হযরত আবু হুরাইয়া (রাযি) রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা‘আলা যাদেরকে মাল দান করেছেন, তারা যদি যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সেই মালের দ্বারা বিষাক্ত সাপ বানানো হবে এবং সে সাপ তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮।]

৪১. **রোযা রাখা**

রোযার ফযীলত সম্বন্ধে এবং রোযা ছাড়লে যে কত বড় গুনাহ হয়, সে বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ, ইচ্ছাপূর্বক রমযানের কোন একটি রোযা ছেড়ে দিলে সারা জীবন রোযা রেখেও তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৯।]

৪২. **হজ্ব করা (উমরা পৃথক আমল হলেও তা হজেরই একটি পর্যায়)**

হযরত আবু উমামা (রাযি) হতে রিওয়ায়েত আছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, গরিব হওয়া, বাদশাহর জুলুমগ্রস্ত হওয়া কিংবা রোগাক্রান্ত হওয়া (এই তিন কারণে হজ্ব না করতে পারলে, তাতে গুনাহ হবে না); এই তিন প্রকার বাধা-বিঘ্নের কোন একটি না থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব না করবে, তার ইচ্ছা, চাই সে ইহুদী হয়ে মারা যাক অথবা নাসারা হয়ে মারা যাক। অর্থাৎ মুসলমান হিসেবে তার মৃত্যু শংকামুক্ত নয়। [সূত্রঃ সুনানে দারিমী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা -৪৫।]

অবশ্য রোগাক্রান্ত ধনী ব্যক্তির হজ্ব মাফ হবে না। রোগমুক্তির সম্ভাবনা না থাকলে তার ওপর হজ্ব বদল করানো জরুরী।

৪৩. **ইতিফাক করা**

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি) রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা যাবৎ না ওফাত দিয়েছেন, সে যাবৎ তিনি সর্বদা রমযান শরীফের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর সম্মানিতা বিবিগণ ই'তিকাফ করেছেন। [সূত্রঃ বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭১ ও মুসলিম শরীফ, খন্ড-১ পৃষ্ঠা -৩৭১।]

৪৪. **হিজরত করা**

ঈমান বাঁচানোর জন্য স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণকে 'হিজরত' বলে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হিজরতের কারণে পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৬]

৪৫. **নযর (মান্নত) পুরা করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমাবরদারি করার নযর (মান্নত) মানবে, তার সে নযর-মান্নত পুরা করতে হবে; কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানী করার মান্নত মানে, তাহলে সেই মান্নাত পুরা করা যাবে না। এ ধরণের মান্নত করা গুনাহ। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৯১]

৪৬. **কসম রক্ষা করা**

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

কসম খেলে তা রক্ষা করো। অর্থাৎ কসম খেলে তা ঠিক রাখা অথবা কসম ভঙ্গ হলে, তার কাফফারা দেয়া কর্তব্য।

[সূত্র :সূরাহ মায়িদা, আয়ত-৮৯।]

৪৭. **কাফফারা আদায় করা**

কাফফারা চার প্রকার। যথা-

ক. কসমের কাফফারা,

খ. ভুলবশত খুনের কাফফারা,

গ. স্ত্রীর সাথে যিহার করার কাফফারা ও

ঘ. রমযানের রোযার কাফফারা। এ সকল ব্যাপারে কাফফারা ওযাজিব হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কাফফারা আদায় করা ঈমানের দাবি।

৪৮. **সতর ঢাকা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহপাকের ওপর এবং কিয়ামত দিনের ওপর যে ঈমান রাখে, সে যেন কাপড় পরে হাম্মামে (গোসলখানায়) যায়, অর্থাৎ মানুষদের সম্মুখ দিয়ে সতর খুলে না যায়।

[সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৭।]

৪৯. **কুরবানী করা**

হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম (রাযি) হতে রিওয়ায়েত আছে, একদা সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহু! এই কুরবানী কী জিনিস? হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)- এর তরীকা । সাহাবীগণ আরয করলেন, হুযূর! আমরা এর প্রতিদানে কী পাব? হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী পাবে। [সূত্র : ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২২৬।]

কুরবানীর ফযীলত সম্বন্ধে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

৫০. **মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা**

হযরত জাবির (রাযি) রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা তোমাদের কোন মুসলমান ভাইকে কাফন দাও, তখন ভালোভাবে কাফন দিবে।

[সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৬]

৫১. **ঋণ শোধ করা**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি) রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে পারলে, সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু পরের ঋণ অর্থাৎ বান্দার যে কোন প্রকার হক মাফ হয় না।

[সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৫।]

সুতরাং, খুব বেশি জরুরী দরকার ও একান্ত অপারগতা ব্যতীত ঋন গ্রহণ করাই অনুচিৎ। তারপরেও ঠেকায় পড়ে ঋণ করলে ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথেই তা পরিশোধ করে দেয়া ঈমানের দাবি। যাতে করে করজদাতাকে কষ্টে না ফেলা হয়।

মুসলমান ভাইগণ! পরের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকা বড় মারাত্মক কথা। চিন্তা করে দেখুন, শহীদের মর্তবা হতে বড় মর্তবা আর কার হতে পারে? অথচ সকল প্রকার গুনাহ মাফ হলেও বান্দার হক মাফ হবে না।

৫২. **ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা বজায় রাখা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সত্যবাদী খাঁটি বিশ্বস্ত কারবারী-ব্যবসায়ী হাশরের ময়দানে নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গী হবে।

[সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা -২৩০।]

৫৩. **সত্য সাক্ষ্য দেয়া**

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

সাক্ষ্য গোপন করো না। অর্থাৎ সত্য ঘটনা জেনে তা লুকিয়ে রেখো না। যে তা লুকিয়ে রাখবে, তার আত্মা পাপিষ্ঠ।

[সূত্র : সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৩।]

সত্য ঘটনা জেনেও প্রয়োজনের সময় সাক্ষ্য না দিয়ে গোপন করা দুরুস্ত নয়।

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৬টি কাজ- যা আপনজনের সাথে সম্পৃক্ত

৫৪. **বিবাহের দ্বারা চরিত্র রক্ষা করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করতে পারে, তার বিবাহ করা উচিত। কেননা, বিবাহ করলে চক্ষুর হেফাযত হয় এবং কামরিপুও দমন হয়। [সূত্র : বুখারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৭৫৮ ও মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৪৪৯।]

৫৫. **পরিবারবর্গের হক আদায়**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজের পরিবার পরিজনের জরুরত পূর্ণ করার জন্যে খরচ করাই মালের সর্বোৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার। [সূত্র : মুসলিম শরীফ।]

নিজের পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও চাকর-নওকর, গোলাম-বাদী ইত্যাদিও পরিবারভুক্ত। পরিবার-পরিজনের হক শুধু তাদের খাওয়ানো পরানো আর স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলার নাম নয়, বরং তাদের কুরআন হাদীস ও দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষাদান করা, চরিত্রবান করতে চেষ্টা করা, কুকর্ম, কুসংর্সগ, কুশিক্ষা হতে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের সাথে নরম ব্যবহার করাও তাদের হক (প্রাপ্য)। এ হক আদায় করা ঈমানের শাখা।

৫৬. **পিতা-মাতার খেদমত করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতা-মাতার খুশিতে আল্লাহর খুশি এবং পিতা-মাতার অসন্তুটিতে আল্লাহর অসুন্তুষ্টি নিহিত। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯।]

অন্য হাদীসে আছে, সন্তান পিতা-মাতার চেহারার দিকে মুহাব্বতের নজরে একবার তাকালে তার আমলনামায় একটি কবুল হজ্বের সওয়াব লেখা হয়।

৫৭. **সন্তান লালন-পালন করা**

সন্তানদেরকে দ্বীনি ইলম ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়াও লালন-পালনভুক্ত একটি দায়িত্ব। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে হবে, আর সে তাদেরকেম যত্নের সাথে ইসলামী আদব-আখলাক দিবে এবং তাদেরকে স্নেহের সাথে লালন-পালন করবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

[সূত্র: আল-আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, পৃষ্ঠা-৩৭।]

৫৮. **আত্মীয়তা রক্ষা করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আত্মীয়বর্গের সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, সে বেহেশতে যেতে পারবে না।

[সূত্র : বুখারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা -৮৮৫ ও মুসলিম, খন্ড,-২, পৃষ্ঠা-৩১৫।]

আত্মীয় বলতে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগিনা-ভাগিনী, মামা-খালা, নানা-নানী, দাদা-দাদী ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভুক্ত।

৫৯. **মনিবরের ফরমাবরদার হওয়া**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, গোলাম যদি মনিবের অনুগত থেকে আল্লাহর ইবাদত করে তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। [সূত্র : বুখারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৬।]

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৮টি কাজ-যা অন্য লোকদের সাথে সম্পৃক্ত

৬০. **ন্যায়বিচার করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, তন্মধ্যে ন্যায়বিচারক একজন। [সূত্র : বুখারী, খন্ড-পৃষ্ঠা-৯০]

৬১. **জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা ও জিহাদ করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে পাঁচটি কাজের হুকুম করেছেন, তোমাদের আমি সে পাঁচটি কাজের হুকুম করছি।

ক. ইমামের [ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধানের] আদেশ শ্রবণ করা,

খ. সে আদেশ খুশির সাথে পালন করা,

গ. দ্বীন প্রচার করা এবং দ্বীন প্রচারার্থে জিহাদ করা,

ঘ. দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে হিজরত করা বা স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করা ও

ঙ. খাঁটি মুসলমানদের জামাতের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা অর্থাৎ তাদের আকীদা থেকে সামান্যতম ভিন্ন আকীদা পোষণ না করা। যে জামাআত ছেড়ে অর্ধ হাত পরিমাণও দুরে সরে পড়েছে, অর্থাৎ নতুন কোন আকীদা গ্রহণ করেছে সে ইসলামের রজ্জুকে গর্দান হতে ফেলে দিয়েছে।

[সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা -১১৩-১১৪, ও মুসনাদে আহমাদ, খন্ড -৫ পৃষ্ঠা-৩৩৪।]

জামাতের সাথে থাকার অর্থ এই যে, আকায়িদ-আমলের বিষয়ে আহলে হকের পায়রবি করবে। যে সকল হাক্কানী আলিম-উলামা ও দ্বীনদার মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহ মতে চলেন, তারাই আহলে হক।

৬২. **রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের অসিয়ত করছি, আল্লাহ তা'আলার ভয় সবসময় দিলে জাগরুক রেখো এবং ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ও খলীফা একজন হাবশী গোলাম হলেও তার আদেশ শ্রবণ করে তা পালন করো।

[সূত্র : তিরমিযী শরীফ খন্ড-১, পৃষ্ঠা -৩০০।]

ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করা জরুরী। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলামী নীতি বিরোধী কোন ফরমান জারি করেন, তবে তা মানা জায়িয নয়।

৬৩. দু'পক্ষের কলহ মিটিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কোন দুই দল মুসলমান যদি ঝগড়া-লড়াই করে, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এ ক্ষেত্রে যদি এক দল অন্য দলের ওপর অত্যাচার করে, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যে যাবৎ না তারা আল্লাহর দিকে রুজু হয়। [সূত্র: সূরাহ হুজুরাত, আয়াত ৯।]

৬৪. সৎকাজে পরস্পরে সহায়তা করা

يـٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تُحِلّوا شَعـٰئِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهرَ الحَرامَ وَلَا الهَدىَ وَلَا القَلـٰئِدَ وَلا ءامّينَ البَيتَ الحَرامَ يَبتَغونَ فَضلًا مِن رَبِّهِم وَرِضوٰنًا ۚ وَإِذا حَلَلتُم فَاصطادوا ۚ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَـَٔانُ قَومٍ أَن صَدّوكُم عَنِ المَسجِدِ الحَرامِ أَن تَعتَدوا ۘ وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ ۖ وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوٰنِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ (২)

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সৎকাজ ও পরহেযগারীর বিষয়ে একে অন্যের সহায়তা করা। [সূত্র : সূরাহ মায়িদা, আয়াত-২।]

আক্ষেপের বিষয়, আজকাল যদি কেউ পরহেযগারী অবলম্বন করে ধর্ম পালন করা শুরু করে তাহলে তার সহায়তা তো দূরের কথা, তাকে উল্টো আরো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। আর যদি কেউ কোন ভালো কিছু শুরু করে, তবে তৎসংশ্লিষ্ট সব বোঝা তারই মাথার ওপর ফেলে রাখা হয় এবং সেই সৎকাজকে তার ব্যক্তিগত ভেবে অন্যেরা তার কোন সহযোগিতা করতে চায় না। এটা উচিৎ নয়।

৬৫. 'আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার' করা

আমার বিল মারুফ অর্থ- (নিজে সৎকাজ করার পাশাপাশি) অপরকে সৎকাজের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং নাহী আনিল মুনকার অর্থ (নিজে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি) অন্যকে অসৎকাজে নিষেধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক হওয়া আবশ্যক, যারা মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকবে। তারা অপরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। (যারা এরূপ হবে) তাদেরই (ইহলৌকিক ও পরলৌকিক) জীবন স্বার্থক ও সফলকাম।

[সূত্র : সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত-১০৪]

৬৬. হদ বা ইসলামী দন্ডবিধি কায়িম করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– একটি হদ কায়িম করা চল্লিশ দিনের বৃষ্টি অপেক্ষা অধিক ভাল। অর্থাৎ সুসময়ে চল্লিশ বার বৃষ্টি হলে, দেশে যত পরিমাণ বরকত আসে, একটি হদ কায়িম করলে তদাপেক্ষা অধিক বরকত আসে।
[সূত্র : ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা–১৮২।]

৬৭. জিহাদ করা বা দ্বীন জারি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–তোমাদের ওপর জিহাদ ফরজ করা হল। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। [সূত্র : আবু দাউদ শরীফ, খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৩৪৩ ও মিশকাত শরীফ খন্ড–১, পৃষ্ঠা ১৮।]
এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আখেরী উম্মতের জন্য শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহর জমিনে দ্বীন কায়িমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করে জান বির্সজন দিতে প্রস্তুত থাকা জরুরী।

৬৮. আমানতদারী ও দিয়ানতদারী রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। [সূত্র : বাইহাকী শরীফ শুআবুল ঈমান খন্ড–৪ পৃষ্ঠা–৭৮ ও মিশকাত শরীফ, খন্ড–১, পৃষ্ঠা ১৫।]

৬৯. মানুষকে করজে হাসানা দেয়

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দান করলে, দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়; আর করজে হাসানা দিলে আঠার গুণ সওয়াব অর্জিত হয়।
[সূত্র: ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা–১৭৫।]

৭০. পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান বজায় রাখতে চায়, সে যেন পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে কষ্ট না দেয়। [সূত্র : বুখারী খন্ড–২, পৃষ্ঠা –৮৮৯, মুসলিম শরীফ খন্ড–১ পৃষ্ঠা –৫০।]

৭১. কারাবারের মধ্যে সততা ও সদাচার অবলম্বন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন ভীষণ প্রকৃতির ফাসিকরুপে উঠানো হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর ভয় দিলে রেখেছে, সদাচারের সাথে বিশুদ্ধ কারবার করেছে এবং সত্যকথা বলেছে, তারা নাজাত পাবে। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খন্ড–১,পৃষ্ঠা–২৩০]

৭২. **অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করা**

يٰبَنِى ءادَمَ خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ (٣١)

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অনর্থক অপচয় করো না।

[সূত্র : সূরাহ আরাফ, আয়াত-৩১।]

বুখারী শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন না। অতিরিক্ত কথা বলা, অর্থের অপব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন ও তর্ক-বাহাস করা।

[সূত্র: বুখারী শরীফ, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২০০।]

৭৩. **সালামের জবাব দেয়া**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক আছে-

ক. সালাম দিলে, জবাব দেয়া। খ. রুগ্ন হলে, সেবা-শুশ্রুষা করা।

গ. মৃত্যুবরণ করলে, কাফন-দাফন করা।

ঘ. ডাক দিলে বা দাওয়াত দিলে, সে ডাকে সাড়া দেয়া।

ঙ. হাঁচি দিলে, জবাব দেয়া।

[সূত্র: খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৬ মুসলিম খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩।]

৭৪. **হাঁচিদাতার জবাব দেয়া**

হাঁচিদাতার জবাব হচ্ছে, হাঁচিদাতা হাঁচি দিয়ে যখন 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর শুকর আদায় করবে, তখন শ্রবণকারী 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে তাকে দু'আ দিবে। হাঁচিদাতার জবাবে এ দু'আ দানের তাৎপর্য হচ্ছে, মুসলমান ভাইয়ের খুশিতে খুশি হওয়া এবং তার দুঃখে দুঃখিত হওয়া। অর্থাৎ এ দু'আর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে যে, তার সামান্যতম খুশিতেও আমরা খুশি।

৭৫. **কাউকেও কোনরূপ কষ্ট না দেয়া**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে হাতের দ্বারা, মুখের দ্বারা, বা অন্য কোন ব্যবহারের দ্বারা কাউকেও কোনরূপ কষ্ট দেয় না। অর্থাৎ সে কারো কোন ক্ষতি করে না। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬।]

৭৬. **অবৈধ খেলাধুলা ও রঙ-তামাশা হতে বেঁচে থাকা**

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন প্রকার খেলা ব্যতীত যত খেলাধুলা আছে, সবই অনর্থক অর্থাৎ পাপের কাজ। সে তিন প্রকার হচ্ছে, জিহাদের জন্যে তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করা, জিহাদের জন্য ঘোড়া দৌড়ানো শিক্ষা করা এবং স্ত্রীর মন রক্ষার্থে তার সাথে কিছু হাসি-রসিকতা করা। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ। খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৩।]

আল্লাহ তা'আলার হুকুম পূর্ণ করার জন্য শক্তি ও সুস্বাস্হ্য জরুরী। সেই নিয়তে কিছু ব্যায়াম, শরীর চর্চা বা জায়িয খেলাধুলা অনর্থক কাজের মধ্যে শামিল নয়।

৭৭. রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে হাদীস শরীফে ঈমানের সবচেয়ে ছোট শাখা হিসেবে বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-ঈমানের সত্তুরের উপরে শাখা আছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা।

[সূত্রঃ মুসলিম শরীফে, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।]

প্রিয় পাঠক! এখন আমরা প্রত্যেক নীরবে একটু চিন্তা করে দেখি, উল্লেখিত ঈমানের শাখাসমূহের কতগুলো আমাদের হাসিল হয়েছে, আর কতগুলো হাসিল হয়নি। যেগুলো আমাদের হাসিল হয়েছে তার ওপর আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করি। আর যা এখনো হাসিল হয়নি, তা হাসিল করার জন্য হাক্কানী আলিমগণের পরামর্শ অনযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং পূর্নাঙ্গ ঈমান হাসিল করে আল্লাহ তা'আলার সুন্তুষ্টি অর্জনে তৎপর হই।

ঈমানের শাখা সম্বন্ধে এখানে অতিসংক্ষেপে যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানার জন্যে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) এর অমর গ্রন্থ 'ফুরুউল ঈমান' পাঠ করুন। এছাড়াও হযরত থানভী (রহ)-এর 'হায়াতুল মসলিমীন, হুকূকুল ইসলাম, বেহেশতী যেওর, সাফাইয়ে মু'আমালাত' এবং তাঁর পছন্দনীয় ইমাম গাযালী (রহ) এর-'তা'লীমুদ্দীন' প্রভৃতি কিতাব সহীহ ইসলামী যিন্দেগী গঠন ও পরিপূর্ণ ঈমান ও আমল অর্জনের জন্য বড়ই উপকারী।

এ পর্যন্ত সহীহ ঈমান-আকীদার বিবরণ পেশ করা হলো। এ সকল ঈমান-আকীদার মধ্যে মানুষেরা যে পরিবর্তন করে ভ্রান্ত আকীদার জন্ম দিয়েছে, তা এখন বর্ণনা করা হচ্ছে। যাতে যেসব ভ্রান্ত আকীদা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

অধ্যায় তিন

ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকীদা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল। খবরদার! অন্যান্য পথ অবলম্বন করো না। অন্যথায় সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত ও সর্তক হও।

[সূত্র : সূরাহ আনআম, আয়াত–১৫৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল, তেমনিভাবে আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি জামা'আত ব্যতীত তাদের সকল ফিরকাই জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) প্রশ্ন করলেন, সেই জামা'আত কোনটি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আমি ও আমার সাহাবীগণের তরীকার ওপর যারা থাকবে।

[সূত্র : তিরমিযী খন্ড–২, পৃষ্ঠা–৯২ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩০।]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আখিরী উম্মত ঈমান ও আকীদার দিক দিয়ে ৭৩ ফিরকা বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে শুধু মাত্র একটি জামাত জান্নাতী হবে এবং অবশিষ্ট ৭২টি ফিরকা ঈমান ও আকীদার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে।

বাস্তবতার কারণে এ কথা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হয়ে গেছে। উম্মতের মধ্যে বহু গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট দলের উদ্ভব হয়েছে। এদের কোন কোনটা সুস্পষ্ট কুফরী আকীদা অবলম্বন করার দরুন দ্বীন ও ঈমানের গন্ডি থেকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে

কাফির সাব্যস্ত হয়েছে। আর কোন কোনটা পথচ্যুত, গোমরাহ ও বিদ‘আতী। তারা কাফির না হলেও নিশ্চিতভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বা আহলে হকের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে।

আহলে হকভুক্ত কোন ব্যক্তি আকীদার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে না, তবে তাদের মধ্যে হতে কেউ কেউ আমলের ত্রুটির কারণে সাময়িকভাবে জাহান্নামী হতে পারে। আর অবশিষ্ট বাতিল ফিরকাসমূহ আকীদা ও আমল উভয় প্রকার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যে সহীত ঈমান ও আকীদা উম্মতের সামনে পেশ করেছিলেন এবং যে নকশার ওপর সাহাবায়ে কিরামকে (রাযি) তৈরী করেছিলেন, পরবর্তীতে মুসলমান নামধারী অনেক লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং দ্বীনে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সহীহ আকীদাসমূহকে পরিবর্তন করে তার স্থলে ভ্রান্ত আকীদার প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রণিধানযোগ্য, শেষ যামানায় অনেক দাজ্জাল-কাযযাবের আবির্ভাব ঘটবে, তারা দ্বীনের নামে এমন অনেক কথা প্রচার করবে, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা কোনদিন শোননি। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, যাতে তারা তোমাদের গোমরাহ না করে ফেলে। [সূত্র : মুসলিম শরীফ। খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৯।]

প্রত্যেক যুগেই অনেক মূর্খ ও বে-ইলম লোকেরা ইসলামের নামে আবিষ্কৃত সেসব নতুন নতুন ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণ করে দ্বীন-ঈমান নষ্ট করেছে এবং আহলে হকের জামা‘আত থেকে খারিজ হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে ফিতনা-ফাসাদ অনেক বেশি হওয়ায় এবং অধিকাংশ লোক দ্বীনি ইলমের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় তাদের অনেকেই ইসলামের নামে সেসব বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে নিজেদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করে ফেলেছে।

তবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ ব্যাপারে যে পরিমাণ কিতাবপত্র রচনা ও যতটুকু আলোচনা-পর্যালোচনা দরকার ছিল, তা হয়নি। অপরদিকে

মধুর নামে বিষ পান করানোর ন্যায় বাতিল আকীদায় ভরপুর বই পুস্তকে বাজার ছেয়ে গেছে। বাতিল আকীদার প্রচার ও প্রসার হচ্ছে খুব দ্রতু গতিতে। এহেন নাজুক মুহূর্তে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের লক্ষ্যে সহীহ আকীদা বর্ণনার পাশাপাশি ভ্রান্ত আকীদাসমূকে আলোচনা অতীব জরুরী মনে করে সেগুলোর আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। যাতে করে কোন মুসলমান দ্বীনের নামে সেসব ভ্রান্ত আকীদা কোনক্রমেই অন্তরে স্থান না দেন। আর খোদা না করুন, যদি কোন মুসলমান সহীহ ইলম না থাকার দরুন ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তিনি যেন সাথে সাথে সেগুলো অন্তর থেকে দূর করে খালিসভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করে সহীহ আকীদা দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেন।

সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ জিদ বা হঠকারিতার আশ্রয় নেয়া বাঞ্চনীয় নয়। কবরে যাওয়ার পরই ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি উত্তীর্ণ হবেন, তিনি সামনের সকল পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাতী হবেন। আর উক্ত পরীক্ষায় যে অকৃতকার্য হবে, সে সামনের সকল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে। আর এ পরীক্ষা একবারই হবে, দুনিয়ার পরীক্ষার ন্যায় একবার ফেল করে দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ সেখানে নেই। আর এ পরীক্ষা প্রত্যেককে দিতে হবে এবং যার পরীক্ষা তাকেই দিতে হবে। সেখানে কোন ওলী-বুযুর্গ, পীর-আওলিয়া, রাজনৈতিক নেতা বা দলপতি কেউ কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে পাশ করিয়ে দিতে পারবে না। এ ধরণের কোন সুযোগ সেখানে নেই।

দুনিয়াতে কোন নেতার প্রভাবে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে পরকালে বুদ্ধি খাটিয়ে সঠিক উত্তর দিয়ে পাশ করে ফেলবে, এমন ধারণা করাটাও একেবারে অর্থহীন। যে ব্যক্তি যে আকীদার ওপর জীবন কাটিয়েছেন এবং যে আকীদার ওপর মৃত্যুবরণ করেছে, পরকালের পরীক্ষার সময় তদ্রুপ উত্তরই তার মুখ থেকে বের হবে এবং সেই উত্তরের ওপর ভিত্তি করে তার জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফায়সালা হবে। তাই সময় থাকতে এখনই যার যার ভ্রান্ত আকীদা ও আমলের ত্রুটি সংশোধন করে নেয়া বাঞ্চনীয়।

বর্তমান সমাজে যেসব ভ্রান্ত আকীদা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে থেকে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো। এথেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

ভ্রান্ত আকীদাসমূহ

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-১ : ইসলামের নামে একটি গোমরাহ ফিরকা এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ ও রাসূল একই সত্ত্বাবিশেষ। অর্থাৎ যিনি রাসূল, তিনিই স্বয়ং আল্লাহ এবং তিনিই 'মুহাম্মদ' নাম ধারণ করে মানুষের আকৃতিতে দুনিয়ায় অবতরণ করেছিলেন। তারা আরো বলে থাকে যে, আহাদ ও আহমদ-এর মধ্যে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। খোদা মীমের যবনিকা টেনে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুরত ধারণ করে লোকালয়ে এসেছেন। নচেৎ উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

এ কথাটির তারা কবিতার মাধ্যমেও বলে থাকে-

স্বয়ং 'মুহাম্মদ নাম ধারণ করে কে এলোরে মদীনায়,
আসল কথা বলতে গেলে পড়বে দড়ি গলায়।' [নাউযুবিল্লাহ]

জবাব : এ ধরণের আকীদা সুষ্পষ্ট কুফর। এরূপ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অতুলীয়। কোন সৃষ্টিজীবের সাথে কোনভাবেই তাঁর তুলনা হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে নবীকে সরাসরি খোদার সাথে তুলনা করা বা খোদা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই সত্ত্বা বলা যে কত বড় জঘন্য অপরাধ ও কুফরী আকীদা, তা অতিসহজেই অনুমেয়।
[সূত্র: সূরাহ শূরা, আয়াত ১১, আকীদাতুত তাহাবী, পৃষ্ঠা ৩১।]

ভ্রান্ত আকীদা-২ : অনেক মূর্খ লোক বিশ্বাস করে যে, ওলী-বুযুর্গ, পীর-সাধক, মাযার-দরবার প্রভৃতি মানুষের মনের মাকসুদ

পুর্ণ করতে পারে, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি দান করতে পারে বিপদ-আপদ দূর করতে পারে। এ ভ্রান্ত আকীদার বশবর্তী হয়ে তারা বিভিন্ন পীরের নামে মান্নত ও নযর-নিয়ায করে, তাদেরকে বা তাদের মাযারকে সিজদা করে, তাদের কবর তাওয়াফ করে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে ইত্যাদি।

জবাব : অথচ মান্নত বা নযর, সিজদা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও প্রার্থনা এ সবই ইবাদত এবং এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং, এগুলো অন্যের জন্য করা কুফরী ও শিরকী কাজ। এর থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয এবং এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। পূর্বেই বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মাকসুদ পূর্ণ করেন, তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং একমাত্র তিনিই মানুষের সকল বিপদ-আপদ দূর করতে পারেন। এ ক্ষমতা তিনি পীর-বুযুর্গ তো দুরের কথা, কোন নবী রাসূলকেও প্রদান করেন নি। তাই কোন নবী-রাসূল, পীর-বুযুর্গ এসব ক্ষমতার কথা কখনো দাবী করেন নি, বা এগুলো বাস্তাবায়িত করে দেখাতে পারেন নি। বরং এসব ব্যাপারে তারাও আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হিসেবে তাদের অনেক দু'আ আল্লাহপাক কবুল করেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কবুল করেন নি। যেমন, হযরত নূহ (আ) তাঁর কাফির ছেলের জন্য দু'আ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন নি। হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের কাফির পিতার জন্য দু'আ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন নি। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর জন্য দু'আ করেছেন, নিজের চাচা আবু তালিব এর জন্য দু'আ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন নি। এ ধরণের অনেক ঘটনার বর্ণনা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে।

সুতরাং, ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোন পীর-আওলিয়া বা মাযারের ইবাদত করা সম্পূর্ণ শিরক এতে ঈমান চলে যায়।

قُل أَغَيرَ اللَّهِ أَبغى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيءٍ ۚ وَلا تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلّا عَلَيها ۚ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ ۚ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّكُم مَرجِعُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم فيهِ تَختَلِفونَ (١٦٤)

[সূত্র: সূরাহ আনআম আয়াত ১৬৪]

وَاتَّبَعتُ مِلَّةَ ءاباءى إِبرٰهيمَ وَإِسحٰقَ وَيَعقوبَ ۚ ما كانَ لَنا أَن نُشرِكَ بِاللَّهِ مِن شَىءٍ ۚ ذٰلِكَ مِن فَضلِ اللَّهِ عَلَينا وَعَلَى النّاسِ وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَشكُرونَ (٣٨)
يٰصٰحِبَىِ السِّجنِ ءَأَربابٌ مُتَفَرِّقونَ خَيرٌ أَمِ اللَّهُ الوٰحِدُ القَهّارُ (٣٩)
ما تَعبُدونَ مِن دونِهِ إِلّا أَسماءً سَمَّيتُموها أَنتُم وَءاباؤُكُم ما أَنزَلَ اللَّهُ بِها مِن سُلطٰنٍ ۚ إِنِ الحُكمُ إِلّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ (٤٠)

[সূত্র: সূরাহ ইউসুফ, আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০. আকীদাতুত তাহাবী, পৃষ্ঠা ৩১।]

মোদ্দাকথা, কোন সৃষ্টজীব বা পদার্থ মা'বুদ কিংবা ইবাদতযোগ্য হতে পারে না। অতএব, যারা গঙ্গার, সূর্যের, রামের, যীশুর, কোন দেবতার, কোন

পীর–পয়গাম্বরের উপাসনা বা পূজা–অর্চনা করে, তারা নির্বোধ, বেঈমান ও কাফির। উল্লেখ্য যে, গঙ্গা, সূর্য, আগুণ ইত্যাদিকে সালাম করা এবং এ সবের সামনে নত হওয়াই প্রকারান্তরে এগুলোর ইবাদত করার শামিল।

ভ্রান্ত আকীদা–৩ : অনেকে তিন খোদা মানে, একে 'তিনে তিনে এক' বলে, হযরত উযাইর (আ) কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে, হযরত মারয়াম (আ) কে খোদার স্ত্রী হিসেবে বিশ্বাস করে, অবতারে বিশ্বাস করে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশরূপে মনে করে, বা পরমাত্মাকে পরমেশ্বর মানে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খোদার আংশিক জাতি নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে।

জবাব : এ সবই শিরক ও কুফর। তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করার কারণে বেঈমান, মুশরিক, কাফির সাব্যস্ত হবে।

لَو أَرادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصطَفىٰ مِمّا يَخلُقُ ما يَشاءُ ۚ سُبحـٰنَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الوٰحِدُ القَهّارُ (٤)

[সূত্র : সূরাহ যুমার, আয়াত ৪]

وَلا تُجـٰدِلوا أَهلَ الكِتـٰبِ إِلّا بِالَّتى هِىَ أَحسَنُ إِلَّا الَّذينَ ظَلَموا مِنهُم ۖ وَقولوا ءامَنّا بِالَّذى أُنزِلَ إِلَينا وَأُنزِلَ إِلَيكُم وَإِلـٰهُنا وَإِلـٰهُكُم وٰحِدٌ وَنَحنُ لَهُ مُسلِمونَ (٤٦)

[সূত্র: সূরাহ আনকাবুত, আয়াত ৪৬, আকীদাতুত তাহাবী,পৃষ্ঠা–৩০]

ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা–৪ : ইহুদী জাতি যেমন হযরত জিবরাঈল (আ) কে নিজেদের দুশমন মনে করতো, তেমনিভাবে অনেক মুর্খ মুসলমানও হযরত আযরাঈল (আ) কে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখায় না। এ কারণে যে, তিনি জান কবয করেন।

জবাব : ইসলামের দৃষ্টিতে ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ। তাঁরা আমাদের অনেক উপকার করেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করা আমাদের জন্য জরুরী। সুতরাং হযরত আযরাঈল (আ) কে খারাপ ভাবা মারাত্মক ভূল। কেননা, হযরত আযরাঈল (আ) আল্লাহর হুকুমের দাস। তিনি আল্লাহর নির্দেশে মাখলুকের জান কবয করেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় কোন মানুষের জীবন হরণ করেন না। তাছাড়া একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, তিনি আমাদের পরম উপকারী। কেননা, তিনি আমাদেরকে দুনিয়ার জেলখানা থেকে পৃথক করে খোদার সান্নিধ্যে নিয়ে পৌঁছান। সুতরাং, কখনো হযরত আযরাঈল (আ) কে খারাপ

ভাবা উচিৎ হবে না। আল্লাহর নির্দেশে তিনি জান কবজ করেন। তাই তাঁকে খারাপ ভাবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বলা ঈমানবিধ্বংসী কাজ।

مَن كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبريلَ وَميكىٰلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلكٰفِرينَ (٩٨)

[সূত্র : সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ৯৮]

يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا ءامِنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَالكِتٰبِ الَّذى نَزَّلَ عَلىٰ رَسولِهِ وَالكِتٰبِ الَّذى أَنزَلَ مِن قَبلُ ۚ وَمَن يَكفُر بِاللَّهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ الءاخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلٰلًا بَعيدًا (١٣٦)

[সূত্র : সূরাহ নিসা, আয়াত-১৩৬, আকীদাতুত তাহারী, পৃষ্ঠা ৮১।]

আসমানী কিতাব সমূহের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-৫ : শি'আদের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, প্রচলিত কুরআন আসল কুরআন নয়, বরং এটি হচ্ছে পরিবর্তিত কুরআন, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে হযরত আলী (রাযি) ও শি'আ সম্প্রদায়ের ইমামদের ব্যাপারে যেসব আয়াত ছিল, হযরত আবু বকর (রাযি) ও হযরত উমর (রাযি) প্রমুখ সাহাবীগণ যেসব আয়াত কুরআন থেকে বাদ দিয়েছেন। আর আসল কুরআন তাদের দ্বাদশ ইমামের নিকট সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে সতের হাজার আয়াত রয়েছে। উক্ত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি আসল কুরআন সাথে নিয়ে আসবেন।

জবাব : এ আকীদা স্পষ্ট কুফরী/আকীদা। যে উক্ত আকীদা পোষণ করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণকারী।

إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحٰفِظونَ (٩)

[সূত্র :সূরাহ হিজর, আয়াত ৯।]

ভ্রান্ত আকীদা-৬ : অনেকে মনে করে যে, ইনজীল শরীফ [খৃষ্টানদের ভাষায় বাইবেল] সহীহ আসমানী কিতাব এবং তা এখনো পর্যন্ত অপরিবর্তিত ও অবিকল অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং, তা বিশ্বাস করতে বা মানতে কোন অসুবিধা নেই।

জবাব : এ ধরণের আকীদা কুফরী। কারণ, কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, পূর্বের সকল আসমানী কিতাব পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

وَمِنهُم أُمِّيّونَ لا يَعلَمونَ الكِتٰبَ إِلّا أَمانِىَّ وَإِن هُم إِلّا يَظُنّونَ (٧٨)

[সূত্র : সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ৭৮।]

বরং বাইবেলেই এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেগুলো বাইবেল বিকৃত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 'বাইবেল সে কুরআন তক' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ভ্রান্ত আকীদা-৭ : জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন যে, কুরআনে কারীমের চারটি বুনিয়াদী পরিভাষা [দ্বীন, ইবাদত,

ইলাহ ও রব] রয়েছে, যার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সকলের নিকটই স্পষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দগুলো তার ব্যাপক অর্থ হারিয়ে অস্পষ্ট ও সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং এ কারণে কুরআনের আসল স্পিরিট নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কুরআনী তা'লীমের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

[কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহে, পৃষ্ঠা- ৮, ৯, ১০]

জবাব : এটাও মারাত্মক ভ্রান্ত আকীদা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনে কারীমের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই যে, কুরআনের শব্দ এবং অর্থ উভয়টার হিফাযতের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। এরূপ কখনো উদ্দেশ্যে হতে পারে না যে, তিনি শুধু বাহ্যিক শব্দগুলোর হেফাযত করবেন, আর অর্থের হেফাযত অন্যের ওপর ন্যস্ত করবেন। ফলে লোকেরা যার যার মন মতো কুরআনের অর্থ করতে থাকবে বা বুঝতে থাকবে। কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা পেশ করার জন্যই আখিরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। তিনি ও দায়িত্ব সঠিকভাবে ও যথাযথরূপে পালন করে গেছেন। তাঁর পরে সেগুলোকে সাহাবীগণ (রাযি) হুবুহু হিফাযত করেছেন এবং পরবর্তীতে যুগের লোকদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এরূপে তা ধারাবাহিকভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের নিকট সহীহভাবে পৌছাতে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের একটি জামা'আত কিয়ামত পর্যন্ত হকের ওপর কায়িম থাকবে। তাদেরকে হক থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না। [সূত্র : মিশকাত, শরীফ, পৃষ্ঠা ৫৮৪।]

সুতরাং, উক্ত চিন্তাবিদের এ চিন্তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া এবং তিনি দেড় হাজার বছর পর উক্ত চারটি শব্দের যে স্বচিন্তাপ্রসূত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শরী'আতে এ ধরণের স্বগর্হিত ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন হয়, যদি ঐ চারটি শব্দের আসল অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দেড় হাজার বছর পর চিন্তাবিদ মহোদয় ঐ অর্থগুলো কীভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন? এখন তো আর ওহী আসার কোন পথ নেই। এ প্রশ্নের কোন প্রকার সদুত্তর চিন্তাবিদ মহোদয় ও তার অনুসারীবর্গ কখনো যে দিতে পারেনি, আর পারবেনও না কোনদিন, এ কথা নির্দিদ্ধায় বলা যায়।

ভ্রান্ত আকীদা-৮ : অনেক লোক এমন আছে, যারা হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা বলে থাকে যে, দ্বীনের ওপর চলার জন্য কুরআন শরীফই যথেষ্ট। হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, হাদীস অনেক ভেজালযুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তার ওপর নির্ভর করা যায় না।

জবাব : তাদের এরূপ ধারনা-বিশ্বাসও কুফরী। এ ধরণের আকীদা পোষণকারীরা নিঃসন্দেহে কাফির। কারণ, কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিধান মুতাবিক চলার জন্য হাদীস বা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ও কাজের অনুকরণ ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

مَن يُطِعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلّىٰ فَما أَرسَلنٰكَ عَلَيهِم حَفيظًا (٨٠)

[সূরা নিসা, আয়াত ৮০]

البَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلنا إِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرونَ (٤٤)

[সূরা নাহল, আয়াত ৪৪]

لَقَد كانَ لَكُم فى رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كانَ يَرجُوا اللَّهَ وَاليَومَ الءاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا (٢١)

[সূরা আহযাব, আয়াত ২১]

সুতরাং, হাদীস না মানলে মূলতঃ কুরআনকে অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করনে, আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এ দু'টি জিনিসকে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্টই হবে না। সে বস্তু দু'টি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত। [সূত্র: মুয়াত্তা মালিক।] অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাউকে যেন আমি এ অবস্থায় না দেখি যে, তার নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন আদেশ বা নিষেধ পৌঁছার পর সে এরূপ মন্তব্য করে যে, আমি এসব হাদীস জানি না; আমি তো কুরআনে যা পাব, সে অনুযায়ী আমল করব। [সূত্র : আবু দাউদ শরীফ। খন্ড-২, পৃষ্ঠা -৬৩২।]

ভ্রান্ত আকীদা-৯ : অনেকে বলে থাকে যে, দ্বীনের ওপর চলার জন্য সরাসরি হাদীসই যথেষ্ট এবং এ জন্য চার মাযহাবের ইমামগণের থেকে কোন ইমামের তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। বরং তারা ইমামের তাকলীদকে শিরক বলে মন্তব্য করে থাকে।

জবাব : তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাধারণ মুসলমান কেন, বিজ্ঞ আলেমের জন্যও সরাসরি হাদীস না বুঝে শরী-আতের ওপর চলা দুঃসাধ্য। এ জন্য সকল যামানায়ই বড় বড় মহাক্কিক আলেমগণও মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে কোন এক মাযহাবের ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ করেছেন। আর যারা কোন ইমামের তাকলীদ ব্যতীত নিজে নিজে হাদীস বুঝতে গিয়েছেন, তারা পদে পদে মুশকিলে পড়েছেন।

নিজে যা বুঝতে অসুবিধা, তা অন্য বিজ্ঞের থেকে বুঝে নেয়াই শরী'আতের নির্দেশ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, তোমরা যদি না জান, পারদর্শী আলেমগণ থেকে জেনে নাও।

وَما أَرسَلنا مِن قَبلِكَ إِلّا رِجالًا نوحى إِلَيهِم ۚ فَسـَٔلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ (٤٣)

[সূত্র: সূরাহ নাহল, আয়াত ৪৩]

وَما أَرسَلنا مِن قَبلِكَ إِلّا رِجالًا نوحى إِلَيهِم ۚ فَسـَٔلوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ (٤٣)

[সূত্র : সূরাহ আনবিয়া, আয়াত ৭]

উল্লেখ্য, শরী'আতের দলিল শুধুই হাদীস নয়, বরং মাশায়িখগণের ঐকমত্যে, শরী'আতের দলিল মোট ৪ প্রকারঃ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সঠিক আমলের পথ নির্ণয়-ই হচ্ছে কিয়াস। এটা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, এর যোগ্যতা যাচাইয়ে ফকীহগণের মধ্যেও কর্মপরিধি জ্ঞাপক শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যাঁরা কুরআন-হাদীস গবেষণা করে মাসলাক নির্ণয়ের মতো প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগের নিকটবর্তী হওয়ায় শরী'আত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা যেভাবে কুরআন-হাদীস বুঝেছেন, উল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে তাদের বুঝকেই গ্রহণ করা উম্মতের জন্য নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত।

তাই সবাই যে যার মতো ক্ষুদ্র জ্ঞানে কুরআন হাদীসের উল্টো ব্যাখ্যা করে শরী'আতকে যাতে মনখাহী তামাশায় পর্যবসিত না করতে পারে, এ জন্য সর্বস্বীকৃত চার মাযহারের কোন একটির অনুসরণ করা ওয়াজিব বলে উলামায়ে উম্মতের ইজমা [ঐকমত্য] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ইজমাকে প্রত্যাখাত করে উল্টো পথে ধাবিত হওয়া কারো জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা ইজমায়ে উম্মতকে মান্য করা জরুরী বলে ঘোষণা করেছেন।

وَمَن يُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدىٰ وَيَتَّبِع غَيرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّىٰ وَنُصلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَساءَت مَصيرًا (١١٥)

[সূত্র: সূরাহ নিসা, আয়াত-১১৫।]

মাযহাবের গুরুত্বের কারণেই হানাফী বিজ্ঞ ফকীহগণ মাযহার মানা ওয়াজিব বলেছেন। [সূত্র: ইমদাদুল মুফতীণ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫১, জাওয়াহিরুল ফিকাহ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৭, কিফায়াতুল মুফতী খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৫।]

এছাড়াও আমরা নিজেদের দুরিয়াবি ব্যাপারেও দেখি যে, প্রত্যেক সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্য বিজ্ঞজন থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকি। দুনিয়াবি ব্যাপারে বিজ্ঞজনের তাকলীদ যেমন জরুরী ও যুক্তিগ্রাহ্য, তেমনি আখিরাতের ব্যাপারে ফিকহে পারদর্শীগণের তাকলীদ ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বলতে কি, যারা তাকলীদকে প্রত্যাখ্যান করে সরাসরি হাদীস বোঝাকে যথেষ্ট বলছেন, তারাও তো সেই হাদীসের ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই কোন উসতাদের নিকট শিখে বা শুনে থাকবেন। তাই এ ক্ষেত্রে সাধারণ উসতাদের নিজস্ব

ব্যাখ্যার চেয়ে পারদর্শী মুহাক্কিক সাহিবে মাযহাবের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণযোগ্যই বটে। সে ক্ষেত্রে তাকলীদকে শিরক বা নাজায়িয বলা বড়ই বিপজ্জনক এবং তা সাধারণ লোকদেরকে উলামায়ে কিরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক মহাষড়যন্ত্র বৈকি। এ ব্যাপারে সকলের সর্তক থাকা খুবই জরুরী।

ভ্রান্ত আকীদা-১০ : ভন্ড পীরদের মুরিদেরা বলে থাকে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ রজনীতে নব্বই হাজার কালাম এনেছিলেন। এর থেকে মাত্র ত্রিশ হাজার উলামায়ে কিরাম জানেন, আর অবশিষ্ট ষাট হাজার ফকীর, দরবেশ ও খাজাবাবাগণ জানেন। যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলী (রাযি), অতপর তার থেকে হাসান বসরী (রহ), এভাবে ধারাবাহিকরূপে একজনের অন্তর থেকে অন্যজনের অন্তরে প্রবেশ করেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত তারা এসব জ্ঞান লাভ করেছেন। সেই ষাট হাজার কালামের ব্যাপারে আলেমগণ কোন খবরই রাখেন না। এ জন্য তারা খাজাবাবা, মাযার, ওরশ ইত্যাদির বিরোধিতা করেন।

জবাব : জাহিল মুরিদদের এ আকীদা কুফরী আকীদা এবং এটা নবী পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর নিছক মিথ্যা অপবাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদাপ্রদত্ত কোন হুকুম-আহকাম গোপন করেননি।

وَما هُوَ عَلَى الغَيبِ بِضَنينٍ (٢٤)

[সূত্র : সূরাহ তাকবীর, আয়াত-২৪।]

তাছাড়া সেই যামানার লোকেরা উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে হযরত আলী (রাযি)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি তা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে বলেন, আমাকে এ ধরণের কোন কালাম দেয়া হয়নি।

[সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩০০। বুখারী শরীফ খন্ড-১, পৃষ্ঠা -২১]

ভ্রান্ত আকীদা-১১ : জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন,দ্বীনের অর্থ হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত, আর দ্বীনের মধ্যে আসল হলো জিহাদ। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এ সবই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের ট্রেনিং কোর্স মাত্র। [সূত্র : খুতবাত ৩০৭, ৩১৫।]

জবাব : এ ধরণের বহু নতুন কথা ইসলামের নামে লোকেরা সমাজে চালু করেছে। অথচ এ ধরণের নতুন কথা এবং শরী'আতের নতুন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ কুরআন-হাদীসে নেই। এ ধরণের নতুন কথা ও কাজকে

শরী‘আতের পরিভাষায় ইলহাদ, তাহরীফ [অর্থগত বিকৃতি] এবং কোন কোনটি ‘বিদ‘আত’ বলে । ইলহাদ তো সুস্পষ্ট কুফর। আর বিদ‘আতের হাকীকত হলো, দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা এবং নিজে শরী‘আত প্রণেতা সাজা। এটা এত বড় অপরাধ যে, সাধারণত এ জাতীয় গুনাহ থেকে তাওবা নসীব হয় না। (নাউযুবিল্লাহ)।

দ্বীনের অর্থ কোন হাদীসে বা তাফসীরে ‘ইসলামী হুকুমত’ বলা হয় নি, বা আরবী কোন অভিধানেও এ অর্থ পাওয়া যায় না। তাছাড়া দ্বীনের এই রাজনৈতিক ব্যাখ্যা মেনে নিলে মারাত্মক এক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তা এই যে, আল্লাহ তা‘আলা লক্ষাধিক নবী-রাসূল (আ) কে তাঁর মনোনীত দ্বীন কায়িমের লক্ষ্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্য হতে সীমিত সংখ্যক নবী রাসূল (আ) ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।

[সূত্র: তাফসীরে মাযহারী খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৭, আল ইলমু ওয়াল উলামা, পৃষ্ঠা ২৮৬।]

অবশিষ্ট সকলেই ইসলামী হুকুমত ও রাষ্ট্র পরিচালনা ছাড়াই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়িম করেছেন। এমতাবস্থায় দ্বীনের অর্থ যদি ইসলামী হুকুমত ধরা হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে এ কথা মেনে নিতে হয় যে, অধিকাংশ নবী-রাসূল (আ) দ্বীন কায়িমে কামিয়াব হননি। কত মারাত্মক কথা!

তাছাড়া এ কথাও সঠিক নয় যে, দ্বীনের মধ্যে আসল হলো জিহাদ। আর নামায, রোযা ইত্যাদি হচ্ছে সেই জিহাদেরই ট্রেনিং কোর্স। কুরআন, সুন্নাহ ও সকল হাক্কানী উলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত হলো, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এগুলো হলো দ্বীনের বুনিয়াদী ও মৌলিক ইবাদত। আর আল্লাহর জমিনে দ্বীন কায়িম করার প্রচেষ্টার নাম হলো জিহাদ। যেমন, হাক্কানী উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে দ্বীনের বিভিন্ন বিভাগে সহীহভাবে যেসব মেহনত চলছে, সেসবই জিহাদের অর্ন্তভূক্ত। সুতরাং, জিহাদ মূল লক্ষ্যবস্তু নয়; তবে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন কায়িম করার উপায় ও উপলক্ষ হিসেবে ইসলামী হুকুমত কায়িম বা তার প্রচেষ্টা চালানো জরুরী।

[সূত্র : কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ৯৯।]

মোদ্দাকথা, দ্বীনের মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী।

وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ (٥٦)

[সূত্র: সূরাহ যারিয়াত, আয়াত-৫৬, বুখারী খন্ড ১, পৃষ্ঠা-৬]

আর আল্লাহর বন্দেগী তথা সহীহ ঈমান ও আমলে সালিহা [যার মধ্যে ইসলামী হুকুমত কায়িমের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শরী‘আত সমর্থিত পদ্ধতিতে চালিয়ে

যাওয়াও শামিল]- এর নগদ পুরষ্কার হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ইসলামী হুকুমত দান করেন।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم فِى الأَرضِ كَمَا استَخلَفَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم دينَهُمُ الَّذِى ارتَضىٰ لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم أَمنًا ۚ يَعبُدونَنى لا يُشرِكونَ بى شَيـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الفٰسِقونَ (٥٥)

[সূত্র : সূরাহ নূর, আয়াত ৫৫।]

যেমন-আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যদি ইসলামী হুকুমত দান করেন, তাহলে মুসলমানগণ সেই ইসলামী হুকুমতের মাধ্যমে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি কায়িম করবে। সম্পূর্ণ হুকুমতকে তারা দ্বীন কায়িমের এবং জনগণের খিদমতের জন্যে কাজে লাগাবে।

الَّذينَ إِن مَكَّنّٰهُم فِى الأَرضِ أَقامُوا الصَّلوٰةَ وَءاتَوُا الزَّكوٰةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عٰقِبَةُ الأُمورِ (٤١)

[সূত্র : সূরাহ হজ্ব, আয়াত ৪১]

আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইসলামী হুকুমত দান না-ও করেন, তবুও মুসলমানদের সাধ্যানুযায়ী দ্বীনের কাজ করে যেতে হবে। ইসলামী হুকুমতের আশায় দ্বীনের কাজ না করে বসে থাকার কোন অনুমতি নেই।

এখন আসুন, চিন্তাবিদ মহোদয়ের কথা অনুযায়ী যদি নামায-রোযাকে জিহাদের ট্রেনিং কোর্স হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন হয়, ট্রেনিং কোর্স কি সারাজীবন এক ধরণের থাকে না ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়? দ্বিতীয়ত নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে ট্রেনিং কোর্স ধরা হলে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কায়িম হওয়ার পর ট্রেনিং কোর্সের প্রয়োজন কি? তৃতীয়ত যাদের উপর কখনো জিহাদ ফরয হয় না, যেমন অন্ধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মাযুর, তাদের ওপর নামায, রোযা ফরয হওয়ার অর্থ কী? সুতরাং উক্ত ধারণা কোনভাবেই সহীহ হতে পারে না। বরং তা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন হওয়ার কারণে সুষ্পষ্ট গোমরাহী। এরূপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

ভ্রান্ত আকীদা-১২ : জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন যে, কুরআনের তাফসীর করার জন্য একজন অধ্যাপকই যথেষ্ট; এজন্য আলিম হওয়া জরুরী নয়। তার এ দর্শনের ভিত্তিতে বর্তমানে অনেক জেনারেল শিক্ষিত লোকদেরকে [যারা কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত জানে না] তাফসীর করতে দেখা যায়। সেই চিন্তাবিদ সাহেব স্বীয় তাফসীরের ভূমিকায় লিখেছেন, আমি তাফসীর লিখতে গিয়ে তাফসীরের পুরাতন ভান্ডার থেকে কোন সহযোগীতা নেয়ার চেষ্টা করি নি। বরং এক একটি আয়াত তিলাওয়াত করার পর উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমার মন-মস্তিস্কে যে প্রভাব পড়েছে, আমি হুবহু তা তাফসীর হিসেবে লিখে দিয়েছি। [সূত্র : তানকীহাত-১৭৫, ২৯১]

জবাব : উল্লেখিত কথাগুলো শরী'আতের দৃষ্টিতে মারাত্মক ক্ষতিকর ও ঈমানবিধ্বংসী। এ ধরণের তাফসীরকে বলা হয়, 'তাফসীর বির রায়' বা মনগড়া তাফসীর, যা সম্পূর্ণ হারাম। এভাবে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করা, লেখা, শ্রবণ করা ও সে তাফসীর পড়া–সবই হারাম। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নিজের রায় মুতাবিক তাফসীর করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামের মধ্যে নির্ধারণ করে নেয়।

[সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ, খন্ড–২, পৃষ্ঠা–১২৩ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৫।]

সকল হাক্কানী উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে কুরআনের তাফসীর করার জন্যে ১৫টি বিষয়ের ওপর দক্ষতা ও বুৎপত্তি অর্জন করা জরুরী।

[সূত্র : মিরকাত খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯২, ইতকান, পৃষ্ঠা ১৮১।]

যাতে করে আরবী ভাষার ওপর এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) যে তাফসীর ধারা বর্ণনা করেছেন, তা সামনে রেখে তাফসীর বর্ণনা করা যেতে পারে। উক্ত ১৫টি বিষয়ের ব্যাপারে যার দক্ষতা ও পারদর্শিতা নেই, শরী'আতের দৃষ্টিতে তার জন্যে তাফসীর লেখা বা তাফসীর করার অনুমতিও নেই। এরূপ ব্যক্তির তাফসীরকে 'তাফসীর বির রায়' বা মনগড়া তাফসীর বলা হয়। আর ঐ ধরণের তাফসীর দ্বারা মুসলমানদের মাঝে কেবলমাত্র গোমরাহী ছড়ায় এবং এর দ্বারা ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এটা নিঃসন্দেহে ঈমান বিধ্বংসী কাজ, যা ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। চিন্তাবিদ মহোদয়ের অধ্যাপকগণ ১৫টি বিষয়ের ওপর পারদর্শী হওয়া তো দূরের কথা, এ সবগুলোর নামও জানেন না, অথচ তাঁরা তাফসীর করছেন।

ভ্রান্ত আকীদা–১৩ : অধুনা নব্য শিক্ষিতদের অনেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, নামায–রোযা আদায় করা, পর্দা রক্ষা করা ইত্যাদি ফরয কাজ সমূহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে এবং সুদ, ঘুষ, মাতা–পিতার নাফরমানী, গান–বাদ্য, সিনেমা, টিভি ইত্যাদি গুনাহের কাজকে হারাম মনে করে না। বরং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করে।

জবাব : তাদের জন্যে এসব হারাম কাজসমূহকে বৈধ মনে করা কুফরী। এর দ্বারা তারা ঈমান ও ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বাহ্যিকভাবে

যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী করছে, তা-ও কোন কাজে আসবে না। আদমশুমারীতে তাদেরকে মুসলমান শুমার করলেও আল্লাহর দরবারে তারা মুসলমানরূপে গণ্য হবে না।
জেনে রাখুন, সারা জীবন কেউ সক্ষম ফরয পালন না করে এবং গুনাহ করতে থাকে, কিন্তু কোন ফরযকে অস্বীকার না করে বা কোন গুনাহকে হালাল মনে না করে, তাহলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হবে না; বরং সে মু'মিনই থাকবে। তবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের কারণে ফাসিক ও গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে কোন একটি ফরযকে অস্বীকার করলে কিংবা হারামকে হালাল মনে করলে, তা কুফরী কাজ হবে এবং তাতে সে ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

নবীগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-১৪ : কাদিয়ানী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবি করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী নন!। বরং তাঁর পরেও আরো নবী আসতে পারেন। এর কিছুদিন পর সে নিজেই নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে। আর অনেক মূর্খ লোক তাকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে।

জবাব : মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করা বা এরূপ সমর্থন করা প্রকাশ্য কুফর। নবুয়াত দাবি করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজে কাফির হয়েছে এবং এ দাবী মেনে নেওয়ার কারণে তার অনুসারীরাও কাফির হয়েছে। নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। মুফতী আযম শফী (রহ) তৎপ্রণীত, 'খতমে নবুওয়ত' নামক কিতাবে প্রায় একশটি আয়াতে কুরআনী পেশ করেছেন

ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِن رِجالِكُم وَلٰكِن رَسولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيّـِنَ ۗ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَليمًا (٤٠)

[সূরাহ আহযাব, আয়াত ৪০]

وَالَّذينَ يُؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبلِكَ وَبِالءاخِرَةِ هُم يوقِنونَ (٤)

[সূরাহ সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ৪]

ইত্যাদি এবং দু'শর বেশি সহীহ হাদীস পেশ করেছেন। [সূত্র :বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা ৫০১] ইত্যাদি।
যে গুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবীই শেষ নবী এবং তাঁর দ্বারা নবুওয়াতের ও ওহীর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া কুরআনের পূর্ববর্তী সকল আসমানী

কিতাবেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করা করা হয়েছে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইনতিকালের পর যখন ‘মুসাইলামাতুল কাযযাব’ নবুওয়াত দাবি করে, তখন এই মর্মে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের (রাযি) ইজমা প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে যে, আমাদের নবীই শেষ নবী। তাঁর পরে কোনক্রমেই আর কোন নতুন নবীর আগমন ঘটতে পারে না। সুতরাং, যে কেউ এখন নবুওয়াতের দাবি করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাকে কতল করা জরুরী। উল্লেখিত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কতল করে উম্মতের ঈমান হেফাযতের ব্যবস্থা করেন।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত দাবি প্রমাণের জন্যে যেখানে কুরআনের একটা আয়াতই যথেষ্ট ছিল, সেখানে প্রায় এক’শ আয়াত এবং দু’শর অধিক হাদীস প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল হাক্কানী উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের নবীর পরে যে কেউ নবুওয়াতের দাবি করবে, সে কাফির এবং তাকে যে ব্যক্তি নবী হিসেবে স্বীকার করবে, সেও কাফির। এমনকি মিথ্যুক নবীর নিকট তার নবুওয়াতের দলিল জানতে চাওয়াও কুফরী কাজ। কারণ দলিল-প্রমাণ চাওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এখনো নতুন নবী আগমনের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তোমার দলিল সঠিক হলে তোমাকে নবী হিসেবে স্বীকার করা যাবে। [নাউযুবিল্লাহ]

সুতরাং, মুসলমানগণ এ ব্যাপারে খুব সর্তক থাকবেন। আহমদিয়া বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় এখন বাংলাদেশের বড় ও প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে তাদের অফিস খুলে আস্তানা গেড়েছে। সেখানে তারা বড় বড় অক্ষরে কালিমায়ে তায়্যিবা লিখে রেখেছে। তাদের নাম মুসলমানদের নামের মতো। তারা মুসলমানদের মতো কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মর্জি মত কুরআনের ব্যাখ্যা করে। তারা বই-পুস্তক রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করে এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখায়। খবরদার ! কখনো তাদের ফাঁদে পা দিবেন না। তারা এমনও বলে যে, তোমাদের মাঝে তো হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ইত্যাদি মাযহাব রয়েছে। আহমদিয়া জামাআতও তেমনি একটি মাযহাব। এটা নির্লজ্জ মিথ্যাচার। চার মাযহাবের মধ্য মূল আকীদার

বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ নেই। হ্যাঁ এ ধরণের মতভেদ রয়েছে যে, নামাযের মধ্যে আমীন আস্তে না জোরে পড়তে হবে, হাত বুকে না নাভির নিচে বাঁধতে হবে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে হবে কি না? ঈদে ছয় তাকবীর না বারো তাকবীর ইত্যাদি। এ ধরণের ছোটখাট কয়েকটি মাসআলা নিয়ে কেবল তাদের মধ্যে মতভেদ, আর এসবই আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে, ঈমান-আকীদার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই, ঈমান-আকীদার ব্যাপারে সকল মাযাহাবই এক। সুতরাং সাবধান! আহমদিয়া জামা'আত কখনো হানাফী, শাফেঈ মাযহাবের মতো নয়। বরং তারা ভ্রষ্ট ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মতো কাট্টা কাফির ও বেঈমান।

তারা বলে থাকে যে, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতামুন নাবিয়্যীনরূপে বিশ্বাস করি, বরং আমাদের আকীদার সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের চেয়ে এক'শ গুণ বেশি বিশ্বাস করি। কিন্তু খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ-শেষ নবী নয়। কারণ এ অর্থ গ্রহণ করার দ্বারা মূলত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আধ্যাত্মিক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করা হয়।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের এরূপ উক্তিও একটি মারাত্মক ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ বহু হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে খাতামুন নাবিয়্যীন হিসেবে উল্লেখ করার সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, আমার পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। এরূপ ব্যাখ্যা তিনি এ জন্যেই দিয়েছিলেন, যাতে করে কাদিয়ানীদের মত গোমরাহ দলসমূহ খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার কোন সুযোগই না পায়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা প্রমাণের জন্যে নতুন নবীর আগমনের দাবিও ভিত্তিহীন। বরং নতুন নবী না আসলে তাঁর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আরো বেশি প্রকাশ পায়।

অনেক নব্য শিক্ষিত লোক এমন রয়েছে, যাদের দ্বীনি জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। ফলে তারা কাদিয়ানী ও আহমদীদেরকে কাফির আখ্যায়িত করাটাকে উলামায়ে কিরামের সংকীর্ণতা বলে মনে করে। এটা তাদের চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। আহমদী জামা'আত বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের মতভেদ রয়েছে ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে। কারণ কাদিয়ানী

মতবিরোধিতাকে কখনো হানাফী, শাফেঈ ও মালিকীদের মতো পারস্পরিক [ফিকহী মাসাইল সম্পর্কিত] মতবিরোধিতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে না। কারণ, কাদিয়ানীরা নিঃসন্দেহে কাফির। এদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এরা সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। মুসলমানদের ঈমানের হিফাযত উলামায়ে কিরামের বিশেষ দায়িত্ব। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন এবং পরকালের জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যিম্মাদারী আদায় করেছেন। সুতরাং তাদের এ যিম্মাদারী আদায়কে কিভাবে সংকীর্ণতা বলা যেতে পারে? বস্তুত কাদিয়ানী ভ্রান্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে সর্তক করা আলিমগণের দ্বীনি দায়িত্ব।

ভ্রান্ত আকীদা-১৫ : অনেক শি‘আ সম্প্রদায় বলে থাকে যে, তাদের ইমামগণ মাসুম ও নিষ্পাপ। তারা গায়িব জানেন এবং তারা কুরআনের যে কোন হালাল বস্তুকে যখন-তখন হারাম ঘোষণা করতে পারেন। অনুরূপভাবে যখন ইচ্ছা যে কোন হারাম বস্তুকে হালাল ঘোষনা করার অধিকার রাখেন। তারা আল্লাহর এত বেশি প্রিয় যে কোন নবী রাসূল-বা ফেরেশতা পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী স্থানেও পৌঁছতে পারে না।

জবাব : শি‘আদের এ সকল আকীদাও শরী‘আতবিরোধী ও কুফর।

وَعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُها إِلّا هُوَ ۚ وَيَعلَمُ ما فِي البَرِّ وَالبَحرِ ۚ وَما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعلَمُها وَلا حَبَّةٍ فى ظُلُمٰتِ الأَرضِ وَلا رَطبٍ وَلا يابِسٍ إِلّا فى كِتٰبٍ مُبينٍ (٥٩)

[সূত্র : সূরাহ আনআম, আয়াত ৫৯]

وَإِذا تُتلىٰ عَلَيهِم ءاياتُنا بَيِّنٰتٍ ۙ قالَ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقاءَنَا ائتِ بِقُرءانٍ غَيرِ هٰذا أَو بَدِّلهُ ۚ قُل ما يَكونُ لى أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلقائِ نَفسى ۖ إِن أَتَّبِعُ إِلّا ما يوحىٰ إِلَىَّ ۖ إِنّى أَخافُ إِن عَصَيتُ رَبّى عَذابَ يَومٍ عَظيمٍ (١٥)

[সূত্র : সূরাহ ইউনুস, আয়াত-১৫, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২০৪]

এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ নবী হওয়ার আকীদার পরিপন্থী হওয়ায় তা স্পষ্ট কুফরী। কারণ তাদের ইমামদের জন্য যে, অবাস্তব গুণাবলীর দাবি করা হয়েছে, তাতে তাদের ইমামগণকে নবী-রাসূল (আ)দের চেয়েও ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এই বলে যে, নবীগণও এ সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে যদি নবীদের চেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হতে পারে, তাহলে নতুন নবী আসতে বাধা কোথায়? আসল কথা হলো নবুওয়াতের দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন বাতিলপন্থীদের মাথা গরম হয়ে গেছে। আর নবুওয়াতের সেই বন্ধ দরজা খোলার জন্যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যিল্লী নবী বা ছায়া নবীর নামে, আর শি‘আ সমপ্রদায়ের লোকেরা ইমামতের নামে পুনরায় তা খুলতে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। মুসলমানদের এদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে হবে।

ভ্রান্ত আকীদা-১৬ : শি'আদের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রাযি), হযরত হাসান (রাযি), হযরত হুসাইন (রাযি) ও হযরত আম্মার (রাযি) ব্যতীত সকল সাহাবায়ে কিরাম মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

জবাব : তাদের এই আকীদা কুরআনে কারীমের সূরাহ তাওবার ১০০ নং আয়াত "মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা অগ্রবর্তী -প্রবীণ এবং যারা উত্তমরূপে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহপাক তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবনসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা এবং সূরাহ ফাতহ'র ২৯ নং আয়াত 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের প্রতি মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু-সিজদায় দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন" ইত্যাদি বিভিন্ন আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী হওয়ার কারণে এটা কুফরী আকীদা।

যে সকল লোক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিভিন্ন হাদীসে সমগ্র মানুষের জন্যে আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা ও হাক্কানিয়ত সম্পর্কে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে বিরূপ বিশ্বাস সুস্পষ্ট কুফরী। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ভ্রান্ত আকীদা-১৭ : শি'আদের এক ধর্মীয় নেতা লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি) এবং হযরত উমর (রাযি) শুধুমাত্র নেতৃত্ব ও দুনিয়ার লোভে বহু বছর যাবৎ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছিলেন। অন্যথায় ইসলাম ও কুরআনের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের নেতৃত্বের লোভের বর্ণনা দিতে গিয়ে উক্ত শি'আ নেতা আরো

লিখেছেন যে, 'ক্ষমতা দখলের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো দল সৃষ্টি করতে হলেও তারা পিছপা হতো না। এমনকি যদি কুরআনের কোন আয়াতে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে হযরত আলী (রাযি) এর খিলাফতের কথা ঘোষণা করতেন, তাহলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে হাদীস তৈরী করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরাত দিয়ে আলী (রাযি) এর খিলাফত সংক্রান্ত আয়াত রহিত হওয়ার কথা ঘোষণা করতেন।' (নাউযুবিল্লাহ)

জবাব : হযরত আবু বকর ও উমর (রাযি) দের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা কুফরী আকীদা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। [সূত্র: মিশকাত শরীফ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬০।]

এমনকি মিরাজে তিনি হযরত উমর ফারুক (রাযি) এর জান্নাত পরিদর্শন করেছেন। [সূত্র : বুখারী শরীফ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২০।] তাছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, এসব বিষয়ের উপর আমি ঈমান রাখি এবং আবু বকর ও উমরও ঈমান রাখে। অথচ সেই মজলিসে তাঁদের দু'জনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না।

[সূত্র : বুখারী শরীফ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৭।]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটুকু আস্থা রাখতেন। তারপরও যদি বলা হয় যে, ইসলাম ও কুরআনের সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। তাহলে এটা কতবড় ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার-তা অতিসহজেই অনুমেয়।

ভ্রান্ত আকীদা-১৮ : জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন, নবীগণের জন্য মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়, বরং তাঁদের নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুনাহ থেকে হিফাযত করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হেফাযত তুলে নিলে, তাদের থেকেও সাধারণ মানুষের মতো গুনাহের কাজ হতে পারে। আর বস্তুত আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী থেকে সাময়িকভাবে হেফাযত ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটি গুনাহ সংঘঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে না করে। সেই

চিন্তাবিদ এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাথে কোন কোন নবী থেকে কি কি গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে, তারও একটা ফিরিস্তি পেশ করেছেন।
[সূত্র : তাফহীমাত-২, পৃষ্ঠা : ৫৭, ষষ্ঠ সংস্করণ।]

জবাব : উল্লেখিত আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এটা কুফরী আকীদা। কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে নবী-রাসূলগণের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত ৩১, সূরাহ আহযাব, আয়াত ২১।]

এসব আয়াতের দাবী অনুযায়ী সকল নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসুম ও নিষ্পাপ এবং তাদের থেকে কোনরূপ গুনাহ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এটাই সহীহ আকীদা। প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, যদি প্রত্যেক নবী-রাসূল (আ) থেকে মাঝে মাঝে আল্লাহ তা‘আলা হেফাযত ব্যবস্থা উঠিয়ে নেন, তাহলে সেটা উম্মত কীভাবে বুঝতে পারবে? তারা তো আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী নবী-রাসূল (আ) দের সব কথা ও কাজ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করবে। সুতরাং চিন্তাবিদ সাহেবের উক্ত কথা মানলে নবী রাসূলগণের (আ) সমগ্র জীবনের তা‘লীম তারবিয়্যত সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ কথা বা কাজের সময় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হেফাযত ব্যবস্থা জারি রেখেছিলেন, না রাখেননি? যদি জারি না রেখে থাকেন, তাহলে তাঁর এ কথা তো সহীহ নাও হতে পারে। [নাউযুবিল্লাহ]

কিরূপ জঘন্য কথা! নবী-রাসূল (আ) গণের ব্যাপারে উম্মত যদি এ ধরণের সন্দেহের সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের দ্বীন ও ঈমান কীভাবে কায়িম থাকবে? আরো লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নবী-রাসূল (আ) থেকে হেফাযত ব্যবস্থা উঠিয়ে নিয়ে দু’একটি গুনাহের সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে, তারা খোদা নন’-এ কথার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হয়, নবী-রাসূল (আ) গণ খোদা নন-এ কথা বিশ্বাস করা জরুরী। তবে তা বোঝানোর জন্যে তাদেরকে পাপী সাব্যস্ত করার কি কোন প্রয়োজন আছে? নবী-রাসূলগণের (আ) পানাহারের প্রয়োজন হয়, রোগ-শোক হয়, স্ত্রী-পুত্র-ঘর-সংসারের প্রয়োজন হয়, হাট-বাজার, আরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে, এ ধরণের আরো শত শত মানবীয় গুনাবলী কি এ কথা বোঝাতে সক্ষম নয় যে, তারা মানুষ ছিলেন, খোদা ছিলেন না? বা অন্য কোন মাখলুক ছিলেন না । নবীগণের শানে উল্লেখিত ধরণের অপবাদ নিঃসন্দেহে কুফরী।

ভ্রান্ত আকীদা-১৯ : জনৈক চিন্তাবিদ খিলাফত ধ্বংসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের জন্যে হযরত উসমান (রাযি) কে প্রথম আসামী বানিয়েছেন। তার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় আসামী হচ্ছেন হযরত মু'আবিয়া (রাযি)। [নাউযুবিল্লাহ]

জবাব : তার বর্ণিত এসব তথ্য সম্পূর্ণরূপে শি'আ ও ইহুদীদের দ্বারা লিখিত ইসলামের নামে বিকৃত ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল। ইসলামের কোন সহীহ ইতিহাস দ্বারা এসব বানোয়াট তথ্য প্রমাণিত হয়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে ইসলামের নামে যে ইতিহাস পড়ানো হয়, তারও অবস্থা একই রকম। ইসলামের নামে এসব ইতিহাস শি'আ ও ইহুদী কর্তৃক প্রথমত আরবী ভাষায় লেখা হয়, তারপরে আরবী হতে ইংরেজীতে অনুদিত হয়। এরপর আমাদের কতিপয় পন্ডিত উক্ত ইংরেজী গ্রন্থসমূহ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এসব ইতিহাস পড়ে ইসলামের সঠিক ঘটনা জানার কোন উপায় নেই। বরং এগুলো পড়ে অনেকেই বিভ্রান্তিবশত সাহাবাবিদ্বেষী হয়ে ঈমান হারাচ্ছে। আবার কেউবা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। তারা হযরত উসমান (রাযি) সম্পর্কে এরূপ কুধারণা পোষণ করে যে, তিনি স্বজনপ্রীতি করে নিজের লোকদেরকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। তেমনিভাবে হযরত মু'আবিয়া (রাযি) রাজতন্ত্রের বুনিয়াদ কায়িম করেছেন ইত্যাদি। [নাউযুবিল্লাহ]

তাদের এসব ধারণা একবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন। সহীহ ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থ যেমন, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আত তারীখুল কামিল ইত্যাদি যারা পড়েছেন, তাদের নিকট আমাদের দাবির সত্যতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই খবরদার! ইসলামের নামে গলদ ইতিহাস পড়ে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে ঈমান হারাবেন না। সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা রাখা ও নিফাক এবং একজন মু'মিন-মুসলমানের ঈমানের জন্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভ্রান্ত আকীদা-২০ : কতেক মুর্খ লোক বলে থাকে যে, হযরত নূহ (আ) এর তুলনায় আমাদের নবী বেশি দয়াশীল ছিলেন। হযরত মূসা (আ) বেশি রাগী ছিলেন। আর আমাদের নবী অত্যন্ত নরম মেযাজের ছিলেন। হযরত ঈসা (আ) রাজনীতি জানতেন না, আমাদের নবী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ইত্যাদি।

জবাব : আশ্চর্যের কথা এই যে, অনেক বক্তাও ওয়াযের মধ্যে এরূপ কথা বলে থাকেন। অথচ এর থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী। কুরআন ও হাদীসে এর থেকে পরহেজ থাকার জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দুই নবীর মধ্যে তুলনা করে একজনকে ছোট করে দেখানো বা একজনকে কোন ব্যাপারে অসম্পূর্ণ বা নাকিস গণ্য করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কুফরী কাজ। পয়গাম্বরগণ সকলেই সর্বদিক দিয়ে কামিল ও সর্বগুনে গুণান্বিত ছিলেন।

ءامَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤمِنونَ ۚ كُلٌّ ءامَنَ بِاللَّهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقالوا سَمِعنا وَأَطَعنا ۖ غُفرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيكَ المَصيرُ (٢٨٥)

[সূত্র: সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ২৮৫, বুখারী শরীফ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮৪।]

অবশ্য কামিল হওয়ার ব্যাপারে কারো মর্তবা বেশি আর কারো মর্তবা ছিল কম। তাই সকল নবী সম্পর্কে সুধারণা রাখতে হবে এবং তাদের সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। একজনের তুলনায় অন্যজনকে ছোট, হেয় বা নাকিস গণ্য করা যাবে না।

ভ্রান্ত আকীদা-২১ : নব্য শিক্ষিতদের অনেকে নবী-রাসূলগণের (আ) মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনাসমূহ তাদের যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ধরা না পড়ায় অস্বীকার করে বসে।

জবাব : কুরআন-হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা নবী-রাসূলগণের (আ) মু'জিযা সুপ্রমাণিত। সূতরাং, বিনা বাক্য ব্যয়ে এগুলো মেনে নেয়া এবং এগুলো বিশ্বাস করা ঈমানের জন্যে জরুরী। কেউ এগুলো অবিশ্বাস করলে, তার ঈমান থাকবে না। যেমন, হযরত ইবরাহীম (আ) এর জন্যে নমরুদের আগুণ আল্লাহর আদেশে শান্তিদায়ক ঠান্ডায় পরিণত হয়েছিল।

قُلنا يٰنارُ كونى بَردًا وَسَلٰمًا عَلىٰ إِبرٰهيمَ (٦٩)

[সূরাহ আমবিয়া আয়াত : ৬৯।]

হযরত মূসা (আ) ও তাঁর কওমের জন্যে লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে দেয়া হয়েছিল।

وَرَسولًا إِلىٰ بَنى إِسرٰءيلَ أَنّى قَد جِئتُكُم بِـٔايَةٍ مِن رَبِّكُم ۖ أَنّى أَخلُقُ لَكُم مِنَ الطّينِ كَهَيـَٔةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فيهِ فَيَكونُ طَيرًا بِإِذنِ اللَّهِ ۖ وَأُبرِئُ الأَكمَهَ وَالأَبرَصَ وَأُحىِ المَوتىٰ بِإِذنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِما تَأكُلونَ وَما تَدَّخِرونَ فى بُيوتِكُم ۚ إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايَةً لَكُم إِن كُنتُم مُؤمِنينَ (٤٩)

[সূরাহ আল-ইমরান : ৪৯।]

হযরত ঈসা (আঃ) قم با زن الله বললে মূর্দা জীবিত হয়ে যেত। [সূরাহ ত্বাহা : ৭৭] আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম)- এর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছিল, ইত্যাদি।

اقتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ (١)

[সূরাহ কামার : ১]

বস্তুত কোন বিষয় যুক্তি বা বিজ্ঞান দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হওয়ার পর তা মানার নাম ঈমান নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকে সরল অন্তঃকরণে বিনা যুক্তি-তর্কে মানার নামই হচ্ছে ঈমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নশর, মীযান-পুলসিরাত ইত্যাদি কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো সাইন্স আর যুক্তি দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে কখনো সে এগুলো বুঝতে পারবে না।

কারণ যুক্তি ও সাইন্স পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। আর আখিরাত ও পরকালের বস্তুসমূহ পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সীমার বাইরের জিনিস। সুতরাং, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝাতে চাইলে তার জন্য ঈমান আনা দুস্কর। এ জন্যে সূরাহ বাকারার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, মুত্তাকী হওয়ার জন্য প্রথম গুণ হচ্ছে অদৃশ্য বস্তুসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

لَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ (٣)

[সূরাহ বাকারাহ, আয়াত-৩]

মূলত শরী'আতের বিধানসমূহ হচ্ছে বাদশাহ, আর যুক্তি-বিজ্ঞান হচ্ছে তার দাসীতুল্য। বাদশাহের নির্দেশ পাওয়ার পর তা পালন করার জন্যে তার বাদীর নিকট জিজ্ঞেস করা যেমন বেওকুফী, তেমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নির্দেশ দেয়ার পরে তা গ্রহণ করার জন্য যুক্তি বা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করাও চরম মূর্খতা ও জাহিলিয়্যাত। স্মর্তব্য, যে হযরত আদম (আ) কে সিজদা না করে যুক্তির পথে সর্বপ্রথম পা বাড়িয়েছিল ইবলিস। এরই পরিণতিতে সে আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে চিরজীবনের জন্যে আল্লাহর দুশমন আখ্যায়িত হয়েছে।

ভ্রান্ত আকীদা-২২ : কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাত্রের মধ্যে যে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুক্কাদ্দাস, অতঃপর সেখান থেকে সাত আসমান ও আরশ ভ্রমণ করেছেন, তারপর ফজরের পূর্বে আবার ফিরে এসেছেন- এ ঘটনাকে তারা বিশ্বাস করে না। পশ্চিমা ও ইউরোপওয়ালাদের যুক্তি ও সাইন্স-এর প্রভাবে তারা মিরাজকে কাল্পনিক কাহিনী বলে আখ্যায়িত করে।

জবাব : তাদের এই আকিদা যেহেতু সরাসরি কুরআনে কারীমের সূরাহ বনী ইসরাঈল ১নং আয়াত "পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নির্দশন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা'-এর পরিপন্থী। সুতরাং, তা স্পষ্ট কুফর। মধ্যাকর্ষণ শক্তি ও সময়ের স্বল্পতা

ইত্যাদি যত প্রশ্নই করা হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার মহাকুদরতের সামনে তা নিতান্তই খোড়া ও অবাস্তব। যে খোদা আসমান, জমীন, সময় মধ্যাকর্ষণ শক্তিসহ এতবড় সৌরজগৎ একটা 'কুন' শব্দের দ্বারা সৃষ্টি করলেন, সেই খোদার জন্যে স্বীয় হাবীবকে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে সপ্ত আসমান ও আরশের সফর করানো কোন ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীদের তৈরী বিভিন্ন খেয়াযান যদি মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ভেদ করে তার উপরে যেতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার তৈরী যান 'বুরাক-রফরফ' সেটাকে ভেদ করতে পারবে না কেন? এ সম্পর্কে অবান্তর প্রশ্ন তোলা আহমকিরই পরিচায়ক।

ভ্রান্ত আকীদা-২৩ : অধিকাংশ বিদ'আতী লোকেরা বিশ্বাস করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির-নাযির এবং তিনি গাইব জানতেন। তেমনিভাবে অনেকে তাদের ভন্ডপীর সম্পর্কেও এরূপ আকীদা পোষণ করে যে, তাদের খাজাবাবা গাইব জানে এবং অনেক দূর-দূরান্ত থেকে বিপদগ্রস্ত মুরীদদের বিপদের কথা নিজে জেনে তাকে বিপদমুক্ত করতে পারে।

জবাব : লোকদের এ ধারণাও স্পষ্ট কুফর ও শিরক। কারণ সদা সর্বত্র হাযির-নাযির ও আলিমূল গাইব হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কোন নবী-রাসূল, পীর বুগুর্গ সদা সর্বত্র হাযির-নাযির বা আলিমুল গাইব হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: "তাঁর কাছেই গায়েবের বা অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।"

وَعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُها إِلّا هُوَ ۚ وَيَعلَمُ ما فِي البَرِّ وَالبَحرِ ۚ وَما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعلَمُها وَلا حَبَّةٍ فى ظُلُمٰتِ الأَرضِ وَلا رَطبٍ وَلا يابِسٍ إِلّا فى كِتٰبٍ مُبينٍ (٥٩)

[সূত্র : সূরাহ আনআম, আয়াত ৫৯।]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের বা ক্ষতি সাধনের মালিক নই; তবে আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আর আমি যদি গাইবের কথা জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম। তখন কখনো আমার কোন অমঙ্গল হতে পারত না। আমি তো ঈমানদারদের জন্যে শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।"

قُل لا أَملِكُ لِنَفسى نَفعًا وَلا ضَرًّا إِلّا ما شاءَ اللَّهُ ۚ وَلَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيبَ لَاستَكثَرتُ مِنَ الخَيرِ وَما مَسَّنِىَ السّوءُ ۚ إِن أَنا۠ إِلّا نَذيرٌ وَبَشيرٌ لِقَومٍ يُؤمِنونَ (١٨٨)

[সূত্র : সূরাহ আরাফ, আয়াত ১৮৮]

এ ধরনের অনেকগুলো আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান আছে। তেমনিভাবে অনেক সহীহ হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের পূর্বে হাউজে কাউসারে অবস্হান করবো। আমার নিকট যারা পৌঁছবে, তারা হাউজে

কাউসার থেকে পানি পান করবে এবং যারা সেখান থেকে পানি পান করবে, বেহেশতে পৌঁছার পূর্বে আর কখনো তারা পিপাসিত হবে না। তখন কিছু লোক আমার নিকট পৌঁছবে। কিন্তু তাদেরকে তৎক্ষণাত বাধা দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এ লোকগুলো তো আমার উম্মত! আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, আপনার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে যে কত প্রকার নতুন জিনিস দাখিল করেছে, তা আপনি জানেন না। তখন আমি বলব, ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে আমার পরে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে।
[সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৪৭, মুসলিম শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৯]
এছাড়াও শাফা'আতে কুবরার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণসহ যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ সকল নবীগণের (আ) থেকে নিরাশ হয়ে হাশরের ময়দানে হিসেব শুরু হওয়ার সুপারিশ নিয়ে যখন আমার নিকট পোঁছাবে, তখন আমি সিজদায় পড়ে এমন শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ছানা-সিফাত বর্ণনা করবো, যা আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় আমাকে শিক্ষা দিবেন এবং তা এমন প্রশংসাবাণী হবে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্বে তা কাউকে শিক্ষা দেন নি।
[সূত্র : খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৮৫, বুখারী ও মুসলিম, খন্ড ১, পৃষ্ঠা -১০৯।]
উভয় হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ থেকে গাইব জানতেন না। হাদীসে এ বিষয়ে এরূপ শত শত প্রমাণ বিদ্যামান রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাযি) এর ওপর যখন মুনাফিকরা যিনার অপবাধ দিয়েছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ এক মাস অস্থির ছিলেন। তারপর 'সূরাহ নূর' এর প্রথমাংশ নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৯৬।]
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি) থেকে বর্ণিত হয়েছে যখন খাইবার বিজিত হলো, তখন ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিল এবং বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খেতে দিল। তখন জিবরাঈল (আ কে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে সতর্ক করার পর তিনি মুখ থেকে গোশত ফেলে দিলেন। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬১০।]

গাইব জানার অর্থ : কারোর জানিয়ে দেয়া ব্যতীত নিজে নিজে জানা এবং সর্বপ্রকার গাইবের সংবাদ জানা। এ ধরণের জ্ঞান কোন মাখলুককেই দেয়া হয়নি। তবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব গাইবের খবর জানতেন, সেগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এগুলোর একটিও তিনি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা জানতেন না। আর এটা তার নবুওয়াত বা মর্যাদার পরিপন্থী নয়। কারণ, নবী হওয়ার জন্যে গাইবজান্তা হওয়ার কোন শর্ত নেই। নবীগণ গাইবজান্তা হলে অহীর কী প্রয়োজন ছিল?

দ্বিতীয়ত : তিনি সকল প্রকার গাইব জানতেন না। যেমন, ইতিপূর্বে এতদসংক্রান্ত অনেক ঘটনা ও হাদীস পেশ করা হয়েছে। সুতরাং, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত-জাহান্নাম, কবর-হাশর, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সম্পর্কে যত বর্ণনা প্রদান করেছেন, সেগুলোর ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দান করা হয়েছিল। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলিমুল গাইব' বলে বিশ্বাস করে আল্লাহর বিশেষ গুনাবলির মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শরীক করে নিজের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়।

সাহাবায়ে কিরাম তৎকালীন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তৎকালীন সময় নানা ধরণের প্রশ্ন করতেন, সেগুলোর জবাবের জন্যে তিনি অহী আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন। কুরআনে এ ধরণের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। সুতরাং, যদি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলিমুল গাইব হতেন, তাহলে জবাবের জন্যে অহী নাযিলের অপেক্ষা করার কী প্রয়োজন ছিল? তাছাড়া কুরআন নাযিল হওয়ারই বা কী প্রয়োজন ছিল? আর নবী রাসূলগণ (আ) যখন গাইব জানতেন না, তখন কোন পীর কিংবা খাজাবাবা গাইব জানেন-এরূপ ধারণা অন্তরে পোষণ করা যে কতবড় মুর্খতা, তা বলাই বাহুল্য।

অনেক মূর্খ্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করে। তারা মীলাদ মাহফিলের মধ্যে চেয়ার খালি রেখে দেয় এবং হঠাৎ একসময় সকলে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এগুলো সব মনগড়া কাজ। এর সপক্ষে শরী'আতে কোন দলিল নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) কত দ্বীনি মজলিস করেছেন। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মুহাব্বত রাখতেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের মজলিসে এরূপ কিয়াম করেন নি। এটা একটা আজব ব্যাপার যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম এর প্রকৃত মুহাব্বতকারী সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) দুরুদ পড়ার সময় কখনো কিয়াম না করলেও এসব বিদ'আতীরা দুরুদ পড়তে পড়তে একসময় দাঁড়িয়ে যায়। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা যখন দাঁড়ায়, তখন কিভাবে বুঝতে পারে যে, এ মুহূর্তে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন-যদ্দরুন এখন দাঁড়ানো প্রয়োজন? এবং যখন একটু পরে তারা বসে পড়ে, তখন কী করে তারা বুঝতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন চলে গেছেন? সুতরাং, এখন বসা দরকার। হাস্যকর ব্যাপার যে, তারা যখন বলে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাযির-নাযির, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রস্থান অনুমান করে বসে যায় কিভাবে? যিনি সদা সর্বত্র হাযির-নাযির, আবার প্রস্থান হয় কি করে? কেননা, তিনি তো সদা হাজিরই থাকবেন। দেখা যাচ্ছে-তাদের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী। বলা বাহুল্য, মিলাদ মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন-প্রস্থানের এ ধরণের আকীদা পোষণ করা শিরক-মহাপাপ।

শরী'আতের দৃষ্টিতে, দাঁড়িয়ে বা বসে সব অবস্থায়ই দুরুদ শরীফ পড়া যায়। তবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় দুরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যে কারণে নামাযের আখিরী বৈঠকে তাশাহহুদের পর বসাবস্থায়ই দুরূদ শরীফ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা......) পড়া হয়ে থাকে। সুতরাং বসে দুরূদ শরীফ পড়া যে উত্তম, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। আর সম্মিলিতভাবে একই সুরে অশুদ্ধ উচ্চারণে দরূদ পড়ার পদ্ধতিও শরী'আতে প্রমাণিত নয় এবং শব্দ ও অর্থগত ভুলসহ 'ইয়া নবী' অলা দরূদ-সালাম পড়াও ঠিক নয়। হাদীসের কিতাবে সহীহ দরূদের কোন অভাব আছে কি? তাছাড়া

মীলাদের নামে একটা মাহফিলে দ্বীনের কোন আলোচনা নেই, সুন্নাতের কোন বর্ণনা নেই, অথচ আরবী ফারসী বাংলা ও উর্দু ভাষার কিছু কবিতা পাঠ করা হলো, কয়েকবার ভুল-অশুদ্ধ উচ্চারণে ও গলদ তরিকায় কয়েকবার দুরুদ-সালাম পড়া হলো, আর তাকে মহা ইবাদত ও পূণ্যের কাজ মনে করা হলো, ব্যস। বস্তুত এটা দ্বীনের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং কিছু অর্থলোভী মৌলোভীদের রোজগারের হাতিয়ার মাত্র। দ্বীনের সাথে এগুলোর আদৌ কোর্ন সম্পর্ক নেই। আর আখিরাতে এসব আমলের বিনিময়ে কোন সওয়াবের আশা করাও অবান্তর। বরং ভুয়া ইশকে রাসূলের নামে এ সকল গহির্ত বিদ'আতী কর্মকান্ডের কারণে পরকালে তারা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সুতরাং এ জাতীয় দ্বীনের নামে ধোঁকামূলক যাবতীয় কার্যকলাপ হতে সকল মুসলমানের বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ভ্রান্ত আকীদা-২৪ : অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে যে, তিনি নূরের তৈরী, তিনি শুধুমাত্র মানবাকৃত ধারণকারী বাস্তবিক পক্ষে তিনি সাধারণ মানুষের মত কোন মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নূরের তৈরী অনেক আবার এও বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহর নূরে রাসূল সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহর জাতি বা সত্বাগত নূরে রাসূল সৃষ্টি, তিনি আল্লাহর মূল সত্বার একটি অংশ (নাউযুবিল্লাহ)।

জবাব : উল্লেখিত উভয় আকীদাই সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী বিধ্বংসী আকীদা। কারণ প্রথমত আল্লাহ তা'আলা যে নূরের তৈরী এর কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলার সাথে পৃথিবীর কোন বস্তুর তুলনা নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

لَيْسَ كَمِثْلِه شَيً

কোন জিনিস তার তুলনা নেই।

তাই আল্লাহ তা'আলা নূর বা নূরের তৈরী বলা কোন অবস্থাতেই ঠিক হবে না। সম্পূর্ণ কুফর এবং শিরক হবে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলাকে নূরের তৈরী মানলে তাঁকে মাখলুক তথা সৃষ্টি বস্তু মানতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ) কেননা, নূর মাখলুক আর নূরের দ্বারা যে জিনিস তৈরী সে জিনিসও মাখলুক

হবে। আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুক বলে বিশ্বাস করলে তো সাথে সাথে ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলাতো সবকিছুর খালিক (সৃষ্টিকারী)। তিনি কি করে মাখলুক হতে পারেন?
আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূরের তৈরী বলাও মারাত্মক ভুল, ভ্রান্ত আকিদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সকল মানুষের মতই মাটির তৈরী একজন মানুষ ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন সকল যুগের সবচেয়ে সেরা মানুষ। মানব জাতির গৌরব হিদায়তের নূর বা আলো। রিসালাতের নূর, ঈমানের নূর। বা তাঁর মাটির শরীরে নূরে সংমিশ্রণ ছিল, এটা বাস্তব বৈকি। তাই বলে তিনি নূরে তৈরী বা মানুষ ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন জাতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন মানব জাতিরই অন্তর্ভূক্ত। কারণ মানব জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-তারা পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্ম লাভ করে। মাতৃদুগ্ধ পান করে, ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হতে থাকে, পানাহার নিন্দ্রা-প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদির মত স্বাভাবিক ক্রিয়া কর্মের পাশাপাশি তারা জৈবিক চাহিদার কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতে সন্তান-সন্তাদির প্রজন্ম হয়। তারা সুখে যেমন হাসে-দুঃখেও তেমন কাঁদে, রোগ, শোক ও দুঃখে যেমন তারা কাতর হয় তেমনি যাদু ও বিষক্রিয়ায় তারা চরম কষ্ট পায়। এমনকি মৃত্যুর দুয়ারে পর্যন্ত ঢেলে যায়। আর এ সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য কেবল মাটির তৈরী মানুষের বেলায়ই প্রযোজ্য। এখন এমন কেউ কি আছেন যিনি প্রমাণ করতে পারেন যে মানবী এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যর কোন একটি থেকেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত ছিলেন, কস্মিনকালেও কেউ পারবে না। কারণ, তিনি তো মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ

হে নবী! আপনি বলে দিন! আমি তোমাদের মতই মানবজাতের একজন মানুষ। তবে আমার নিকট ওহী আসে (কেবল এক্ষেত্রে আমি তোমাদের ব্যতিক্রম) [সূত্র : সূরাহ কাহাফ, ১১০]
অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (খাদ্য সার) থেকে সৃষ্টি করেছি।
[সূত্র : সূরাহ মু'মিনূন, ১২]
সুতরাং, উক্ত আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণ হল রাসূল অন্যাণ্য মানুষের মত মাটির তৈরী। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মানুষ বলে বিশ্বাস করা জরুরী। তা না হলে প্রথম আয়াত অস্বীকার করে কাফির হয়ে যাবে। আর যখন মানুষ বলা হল তাহলে দ্বিতীয় আয়াত হিসাবে তার মাটির তৈরী হওয়া জরুরী ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তা না হলে আয়াত অস্বীকার করে কাফির হতে হবে।
তাছাড়া মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি মানুষই না বলা হয়, তাহলে তিনি তো আশরাফুল মাখলুকাত থেকেই বাহির হয়ে যাবেন। যা কিছুতেই হতে পারে না। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে স্বীকার করা হয় তাহলে তাকে অবশ্যই মাটির তৈরী মানুষ হিসাবেই স্বীকার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশদ করেন :

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

বলুন আমার পবিত্র মহান পালন কর্তা, আমি একজন মানুষ রাসূল। [সূরাহ বনী ইসরাইল ৯৩-৯৫] [এছাড়া সূরাহ আরাফ ৬৯, সূরাহ হুদ ২৭, সূরাহ মুমিনূন ৩৩, সূরাহ শুয়ারা ২৩, হা-মীম সিজদা ৬, সূরাহ আম্বিয়া ৩৪]
উল্লেখিত আয়াতেও রাসূলে সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ তথা মাটির তৈরী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঘোষণা করেন :

"اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ"

অর্থাৎ : "আমি তো একজন মানুষ।"
[সূত্র: বুখারী ১,৩৩২/মুসলিম ২:৭৪]
অন্যত্র ইরশাদ :

" اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌمِّثْلُكُمْ "

অর্থাৎ : "আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ।"
[সূত্র : বুখারী ১:৫৮]

এ সব উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরী একজন মানুষ। নূরের তৈরী নন। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকিদা। যদি কেউ ইহার ব্যতিক্রম বিশ্বাস করে তাহলে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থেকে বেরিয়ে যাবে।

কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-২৫ : অনেক মূর্খ লোক বিভিন্ন ভন্ড পীর ও খাজা বাবাদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, তারা কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে যত রকম সমস্যা আছে, সব সমস্যা থেকে মুরীদদেরকে পার করে নিয়ে যাবেন এবং নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সুপারিশ করে তাদেরকে বেহেশতে নিবেন। তাদের বাবারাও বলে থাকেন যে, আমার কোন মুরীদকে পুলসিরাতে রেখে আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো না।

জবাব : এসব আকীদা পোষণ করা এবং এরূপ দাবী কুফরী কাজ। কোন মানুষ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না, সে জান্নাতী। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খোদার কসম! আমি জানি না যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার কী ফায়সালা? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা -১৬৬।]

এ কারণে কেউ নিজের সম্পর্কে জান্নাতী হওয়ার দাবী করতে পারে না। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আশা পোষণ করা যায়। কাজেই আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত এবং বেহেশতের আশা রাখা উচিত।

তেমনিভাবে অন্যের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা তো শরী‘আতের নির্দেশ, কিন্তু এমন বিশ্বাস রাখা বা দাবি করা নিষেধ যে, অমুক ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ওলী বা জান্নাতী। তবে যাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে-হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, তাদেরকে জান্নাতী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কেউ যদি সত্যিকার অর্থে বুযুর্গ বা আল্লাহর ওলী হয়ে যান, তাহলে তাদেরকে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা‘আলা সুপারিশ করার অনুমতি দিলে, তারা লোকদের জন্যে সুপারিশ করতে পারবেন। তবে কেউ

নিজের পক্ষে এরূপ দুঃসাহস দেখাতে পারবে না। কেননা, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে আল্লাহ তা'আলা সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন, কেবলমাত্র তারাই সুপারিশ করতে পারবেন। আর সেটা এমন হবে, যেমন দুনিয়াতে একজন সাধারণ মানুষ বাদশাহের দরবারে সুপারিশ করেন। বাদশাহ এ সুপারিশ কবুল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। সুতরাং কেউ তার মুরীদকে সুপারিশ করে নিশ্চিতভাবে বেহশতে নিয়েই যাবে–এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ শরী'আতবিরোধী।

ভ্রান্ত আকীদা–২৬ : অনেকে নিজের বুযুর্গী জাহির করার জন্যে দাবি করে থাকে যে, তারা দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখে থাকে। আবার অনেক প্রতারক ভন্ড লোকদের জিজ্ঞেস করে যে, তুমি ৭০/৮০ বছর যাবৎ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করছ, কতবার আল্লাহকে দেখেছ? উত্তরে সেই ব্যক্তি যদি বলে, আমি একবারও তো আল্লাহকে দেখতে পাইনি, তখন বলা হয় যে, তাহলে তো তোমার ইবাদত–বন্দেগী কিছুই হলো না। তুমি যদি সঠিকভাবে নামায পড়তে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হতে।

জবাব : লোকদের এরূপ আকীদাও কুফরী। কতিপয় ভন্ডপীর ও খাজাবাবারা লোকদের সহজে নিজের দলে ভিড়ানোর জন্যে এরূপ ফন্দি করে থাকে।

د جاءَكُم بَصائِرُ مِن رَبِّكُم ۖ فَمَن أَبصَرَ فَلِنَفسِهِ ۖ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيها ۚ وَما أَنا عَلَيكُم بِحَفيظٍ (١٠٤)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, "দুনিয়াতে কোন চর্মচক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না।"

[সূত্র : সূরাহ আনআম, আয়াত, ১০৪।]

وَواعَدنا موسىٰ ثَلٰثينَ لَيلَةً وَأَتمَمنٰها بِعَشرٍ فَتَمَّ ميقٰتُ رَبِّهِ أَربَعينَ لَيلَةً ۚ وَقالَ موسىٰ لِأَخيهِ هٰرونَ اخلُفنى فى قَومى وَأَصلِح وَلا تَتَّبِع سَبيلَ المُفسِدينَ (١٤٢)

হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসার আবেগে বিহ্বল হয়ে যখন তাঁর দীদার প্রার্থনা করলেন, তখন জবাবে ইরশাদ হলো " হে মূসা! কস্মিনকালেও দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে পারবে না।"

[সূত্র : সূরাহ আরাফ, আয়াত ১৪২।]

হাদীসে শরীফে এসেছে যে, "জেনে নাও। তোমরা কখনো চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারবে না। হ্যাঁ, মৃত্যুর পর মু'মিনরা হাশরের ময়দানে এবং বেহশতের মধ্যে বেহেশতী চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পারবে। বরং জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে, আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড–১, পৃষ্ঠা –১০০।]

মু'মিনরা দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পারবে না-এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর হিজাব বা পর্দা এমন নূরের, যা আমাদের কল্পনার বহির্ভূত। সে নূরকে কোন চর্মচক্ষু বরদাশতও করতে পারবে না। অথচ সেই সূর্যের দিকে চর্মচক্ষু দ্বারা তাকানোই যখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহলে আল্লাহ তা'আল্লাকে দুনিয়াতে কিভাবে দেখা সম্ভব? তবে বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ শক্তির অধিকারী করে জান্নাতীদের তৈরী করবেন। তখন তাদের মাঝে আল্লাহর দর্শন লাভের ক্ষমতা দান করা হবে। সুতরাং, তখন তারা উক্ত নেয়ামত লাভে ধন্য হতে পারবেন।

অবশ্য দুনিয়াতে স্বপ্নের মধ্যে কেউ আল্লাহকে কোন আকৃতিতে দেখতে পারে, বা খাবের মত অবস্থা যাকে 'ইসতিগরাকী কাইফিয়াত' বলা হয়, সে অবস্থায়ও কেউ কেউ আল্লাহকে অন্তরচক্ষু দ্বারা মুশাহাদা করতে পারে, সেটা সম্ভব। যেটা সম্ভব নয়, তা হলো জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা। সুতরাং কেউ যদি এরূপ দাবি করে, তাহলে তাকে মিথ্যুক, গোমরাহ ও কুফরী আকীদাঅলা বলা হবে। তার থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব ।

তাকদীরের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-২৭ : অনেক মূর্খ লোক আছে, যারা ইবাদত-বন্দেগী, নামায-রোযার ধার ধারে না, সময় পেলেই তাকদীর নিয়ে তর্ক-বির্তক শুরু করে দেয় এবং এমন কথা বলতে শুরু করে, যা ঈমানের জন্যে হুমকিস্বরূপ; যেমন তারা বলে- সবকিছুই যখন আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন, তাহলে চোরের কী দোষ? মদখোরের কী দোষ? আল্লাহ তা'আলা যখন কে জান্নাতী কে জাহান্নামী লিখে রেখেছেন, তাহলে ইবাদত-বন্দেগী করে লাভ কী? আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে সৃষ্টি করলেন কেন? ইত্যাদি বিভিন্ন অমূলক প্রশ্ন তারা করে থাকে।

জবাব : এ ধরণের প্রশ্ন ঈমানের জন্যে ক্ষতিকর।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ (٢٣)

'আল্লাহ তা'আলা যা করেন, তার বিরুদ্ধে আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।' [সূত্র : সূরাহ আমবিয়া, আয়াত ২৩]

সুতরাং আল্লাহর বিরুদ্ধে এ ধরণের আপত্তি ও অভিযোগ করা কুফরী কাজ। মানুষের কামিয়াবী আল্লাহর হুকুম-আহকামকে সরল অন্তঃকরণে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং, কোন যুক্তি-তর্ক বা অভিযোগ উত্থাপন না করে আল্লাহর প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, তিনি যা বলেন, যা করেন, যে আদেশ-নিষেধ করেন, সবই সহীহ, সঠিক ও বান্দার জন্যে মঙ্গলজনক। এর মধ্যে বান্দার অনিষ্টের কিছুই নেই। তাকদীরের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান এই যে, ঈমানের অঙ্গ হিসেবে মনে-প্রাণে তা মেনে নেয়া এবং এ ব্যাপারে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা বা কল্পনাপ্রসূত কোন তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা-পর্যালোচনা না করা কর্তব্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আকল-বুদ্ধি দ্বারা তাকদীরের ব্যাপারে তর্ক-বাহাস করল, তাকে কিয়ামতের দিবসে এ জন্যে জবাবদিহী করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাকদীরের বিষয়ে কোন তর্ক-বাহাস করল না, তাকে এজন্যে কিয়ামতের দিবসে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না।'

[সূত্র : ইবনে মাজাহ ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২২]

অপর এক হাদীসে এসেছে, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে আসলেন। তখন কতিপয় সাহাবী (রাযি) তাকদীরের বিষয়ে তর্ক করছিলেন। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারা মুবারক লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমাদের কি এ বিষয়ে বাহাস করতে আদেশ করা হয়েছে? না আমাকে এ বাহাস করার জন্যে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাকদীরের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা এ ব্যাপারে তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হয়ো না।'

[সূত্র: তিরমিযী শরীফ। খন্ড-২ পৃষ্ঠা ৩৪]

সুতরাং এ ধরণের আপত্তিকর কথাবার্তা কোনক্রমেই না বলা উচিত। এ ধরণের উদ্ভট প্রশ্নকারীদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই সবকিছু জেনে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করে থাকলে, তাতে আমাদের কী? আমরা তো আর সে লেখা দেখিনি বা জানিও না। তাছাড়া তিনি পূর্ব হতে লিখে রাখার দরুন আমাদের শক্তি তো লোপ পায়নি। আমাদেরকে তিনি ভালো-মন্দ বোঝার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার শক্তি দান করেছেন এবং ভালো কাজ করার ও মন্দ কাজ না করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা অতিক্ষুদ্র

মাখলুক ও তাঁর দাস। সুতরাং তিনি আমাদেরকে যে আদেশ করেছেন, তা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য করে নেয়াই আমাদের দায়িত্ব। তিনি কী লিখে রেখেছেন, তা আমাদের দেখার বিষয় নয়। বরং তার হুকুম তামিল করাই আমাদের দায়িত্ব। তাঁর প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করলে কিংবা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলে, এ নাফরমানির দরুন নিশ্চয়ই তাঁর নিকট জবাবদিহী করতে হবে এবং তাঁর প্রদত্ত শক্তির সহীহ ব্যবহার করলে, তাঁর আদেশ পালন করলে তিনি তার উত্তম প্রতিদান দিবেন।
বিস্ময়ের কথা হলো যে, তাকদীরের দোহাই দিয়ে লোকেরা আখিরাতের জন্যে নেক কাজের চেষ্টা-তদবির বন্ধ করে বসে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার ওপর খুবই ভরসা ও তাওয়াক্কুল রয়েছে বলে প্রকাশ করে; কিন্তু দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে, আয়-রোজগার, উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে থাকতে দেখা যায় না; বরং দুনিয়ার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত হুঁশিয়ারি, খুবই কর্মঠ। যত রকম চেষ্টা-তদবির আছে, কোন কিছুই তখন আর বাদ থাকে না। অথচ ঐ সব ব্যাপারও তো সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন যে, তার রিযিক কী পরিমাণ হবে? সে চেষ্টা করুক আর নাই করুক, ঐ পরিমাণ রিযিক তার ভাগ্যে জুটবেই।
مَن كانَ يُريدُ العاجِلَةَ عَجَّلنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصلىٰها مَذمومًا مَدحورًا (١٨)
[সূত্র : সূরাহ বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৮]
এবং শত চেষ্টা-তদবির করেও তার থেকে একবিন্দু পরিমাণ রিযিকও সে বাড়াতে পারবে না।
إِنَّ رَبَّكَ يَبسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ وَيَقدِرُ ۚ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا (٣٠)
[সূত্র : সূরাহ বনী ইসলাঈল, আয়াত ৩০]
উল্লেখ্য যে, মানুষ যতই মেহনত করুক, রিযিকের ব্যাপারে তার ভাগ্যের নির্ধারণ পরিমাণ ঠিকই থাকবে। তবে কেউ ধৈর্য ধারণ করলে হালাল পন্থায় অর্জন করবে, আর কেউ অধৈর্য হয়ে জায়িয-নাজায়িযের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে হারাম পন্থায় তা উপাজর্ন করবে। প্রশ্ন হলো, দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় বিষয় যখন লেখা আছে, তাহলে একটার ব্যাপারে এত চেষ্টা-তদবির এবং দ্বিতীয়টার প্রতি উদাসীনতা কেন? যদিও সে আল্লাহর ওপর ভরসা দেখাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে কি তাই? আসল কথা হলো, তাকদীরের ব্যাপারে আমাদের ঈমান বড় দুর্বল। আখিরাতের ব্যাপারে বিশ্বাস বড় কমজোর এবং আগ্রহের খুবই অভাব। কারণ, অধিকাংশ লোক ঈমান হাসিল করা, তা সহীহ-শুদ্ধ করা ও পাকা-পোক্ত করার ব্যাপারে চরম উদাসীন। এটাকে তোা কোন কাজই মনে করে না; এর প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না

এবং এর জন্যে কোন মেহনতের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। বরং পৈতৃক সূত্রে যে মুসলমানী নাম লাভ করেছে, তাকেই মু'মিন ও মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করে। মুসলিম মিল্লাতের অধঃপতনের জন্য একে মৌলিক কারণ বললে ভুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা সকলকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন।

ভ্রান্ত আকীদা-২৮ : ধন-সম্পদ ও উন্নতি অগ্রগতির ব্যাপারে কিছু লোক বলতে শুরু করেছে যে, এগুলো ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যারা চালাক-চতুর, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পলিসি ও টেকনিক জানা আছে, তারাই নিজ গুনে এ জাতীয় উন্নতি করতে পারে এবং অঢেল সম্পদের অধিকারী বা বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়া তাদের জন্যে কোন ব্যাপারই নয়। তাদের চিন্তাধারা আল্লাহর দুশমন কারুনের চিন্তাধারার ন্যায়।

قالَ إِنَّما أوتيتُهُ عَلىٰ عِلمٍ عِندى ۚ أَوَلَم يَعلَم أَنَّ اللَّهَ قَد أَهلَكَ مِن قَبلِهِ مِنَ القُرونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنهُ قُوَّةً وَأَكثَرُ جَمعًا ۚ وَلا يُسـَٔلُ عَن ذُنوبِهِمُ المُجرِمونَ (٧٨)

[সূত্র : সূরাহ কাসাস, আয়াত -৭৮।]

জবাব : কুরআনের বহু আয়াতে রিযিক ও ধন-দৌলতকে আল্লাহর ফায়সালার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কোন একটি আয়াতেও মানুষের চেষ্টা-তদবিরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাস কুফরী-আকীদা এর থেকে তাদের তওবা করা ফরয।

এই অধ্যায় যেসব ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদার আলোচনা করা হলো, তার দ্বারা উদ্দেশ্য, মুসলমান ভাইদের ঈমান-আকীদার হেফাযত করা। প্রত্যেকে যেন এসব ভ্রান্ত আকীদা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। আল্লাহ না করুন, কেউ অজ্ঞতাবশত যদি এ ধরণের ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তিনি সেগুলো অন্তর থেকে ধুয়ে-মুছে উক্ত ভ্রান্ত আকীদা পরিহার করে খালিসভাবে তাওবা করে নিবেন।

জরুরী হুশিয়ারি : কেউ এই কিতাব পড়ে কারো মধ্যে এমন কুফরী আকীদা প্রত্যক্ষ করলে, যার সম্পর্কে এই কিতাবে কাফির বলা হয়নি। তাকে কাফির বলবেন না বা কাফির ফাতাওয়া দিবেন না। কারণ, কুফরের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, কোনটা উপরের স্তরের, আবার কোনটা নিচের স্তরের। উপরের স্তরের কুফর কারো মধ্যে পাওয়া গেলে, সে ব্যক্তি কাফির ও বেদ্বীন হয়ে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু নিম্নস্তরের কুফর কারো মধ্যে পাওয়া গেলে যদিও উক্ত আকীদা নিঃসন্দেহের কুফর এবং তার পোষণকারী

স্পষ্টভাবে কফির না হলেও নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ, বিদ‘আতী, ফাসিক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থেকে খারিজ। হাদীসে তাদেরকে ৭২ ফিরকার অর্ন্তভূক্ত ও জাহান্নামী বলা হয়েছে, কিন্তু কুফরের এসব স্তর নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। একমাত্র বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উলামা ও মুফতীগনই এগুলো নির্ণয় করতে পারেন। সুতরাং, যেসব আকীদা পোষণকারীকে এ কিতাবে কাফির বলা হয়নি, সে ধরণের কোন আকীদার হুকুম জানার প্রয়োজন পড়লে বিজ্ঞ উলামা ও মুফতীগণ থেকে জেনে নিবেন বলে আশা করি। প্রত্যেকে নিজে আন্দাজ-অনুমান করে দ্বীনের ব্যাপারে কিছু বলবেন না। এটা মহা অপারাধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়ছে

وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسـٔولًا (٣٦)

“যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না।”
[সূত্র : সূরাহ বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬।]

আরা কতিপয় ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-২৯ : নব্য শিক্ষিতদের অনেকে ডারউইনের মতবাদ ‘বানর থেকে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে’- একথা বিশ্বাস করে। অনেকে কতক বিজ্ঞানীর অভিমত হিসেবে বিশ্বাস করে যে, সূর্য তার স্থানেই স্থির অবস্থান করছে। সূর্য ঘুরছে না। আবার অনেকে সুদভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতি বা আল্লাহর নাফরমানীর কথা মেনে নিতে চায় না। কেউবা জন্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে সুখ-শান্তি রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। অনেকে ইংরেজদের তৈরী পাঠ্যসূচীতে শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে অনেক ধরণের পশ্চিমা দর্শন ও ফিলোসফিকে [যা সম্পূর্নভাবে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী] মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এমনকি তাদের ইসলামের বন্ধন অতিদূর্বল ও ক্ষীণ হাওয়ায় তারা এগুলোকে ইসলামের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

জবাব : তাদের এসব বিশ্বাস সর্বস্বই মারাত্মক ভুল। এসব ভুলের দরুন তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অনেক আয়াত ও হাদীসকেই অস্বীকার করে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে নষ্ট করে ফেলেছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী। [সূত্র : সূরাহ নিসা, আয়াত-১]

এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে মানবজতিকে – يا بَنِيْ اٰدَمَ 'হে আদমের সন্তান!' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

পাঠক! চিন্তা করুন, আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন যে, আমি একজোড়া নর-নারী থেকে সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি এবং সেই নর হচেছন হযরত আদম (আ) ও নারী হচ্ছেন হযরত হাওয়া (আ)। আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হচ্ছে নবীর আওলাদ। এখন কোন অমুসলিম যদি বানর থেকে মানুষ তৈরির দাবী করে, তাহলে আমাদের বলার কি আছে? আমরা [মুসলমানগণ] এতটুকুই শুধু বলব যে, বংশতালিকা বা বংশপরম্পরা বর্ণনা করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। আজ হয়তো কেউ তার বংশপরম্পরা বানর থেকে বর্ণনা করছে, আগামীকাল কেউ তার বংশপরম্পরা শুকর থেকে বর্ণনা করবে। আমরা মুসলমান জাতি। আমাদেরও বংশপরম্পরা বর্ণনা করার অধিকার আছে। সেই হিসেবে আমরা বলব যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দৌলতে আমাদেরকে হেফাযত করেছেন। তিনি আমাদেরকে কোন জানোয়ারের বাচ্চা না বানিয়ে তাঁর প্রিয়নবী হযরত আদম (আ) এর সন্তান বানিয়েছেন।

সারকথা, যারা ডারউইনের মতবাদ বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের এ সমস্ত আয়াত বিশ্বাস করে না। তেমনিভাবে যারা বিজ্ঞানীদের এ দর্শন 'সূর্য ঘুরে না, বরং নিজের স্থানে স্থির রয়েছে' বিশ্বাস করে, তারা সূরাহ ইয়াসীনের ৩৮ নং আয়াত।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

অর্থাৎ: " সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে, বিশ্বাস করে না। যারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে উন্নতির বিশ্বাস রাখে, তারা সূরাহ বাকারার ২৭৬ নং আয়াত।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

অর্থাৎ: "আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করনে এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন" বিশ্বাস করে না। অথচ স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কুরআনের কোন একটি

আয়াত অবিশ্বাস করলে ঈমান চলে যায়। এখানে শুধু নমুনা হিসাবে ২/৪ টা বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো। স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে এ ধরণের অনেক বিষয় আছে, যা সরাসরি কুরআনের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। সুতরাং সংশ্লিষ্ট লোকদের কর্তব্য হচ্ছে, এসব পশ্চিমা দর্শন বিশ্বাস না করা এবং এতে প্রভাবান্বিত না হয়ে হাক্কানী উলামায়ে কিরাম থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে এতদসম্পর্কিত বিধান জেনে ঐ সকল ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে কলিজার টুকরো সন্তানদের দ্বীন-ঈমানের হেফাযত করা। দ্বীনদার শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন।

ভ্রান্ত আকীদা-৩০ : নব্য শিক্ষিতদের অনেকে বিশ্বাস করে যে, পরকালের মুক্তি কেবলমাত্র ইসলামের ওপরই নির্ভরশীল নয়; বরং যে কোন ধর্ম অবলম্বন করে সেই ধর্মমতে চললে সে ব্যক্তি পরকালে নাজাত পাবে! চাই সে খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী হোক বা ইহুদী ধর্মের অনুসারী হোক, কিংবা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হোক অথবা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হোক। আবার অনেকে বলে, মানব সেবাই আসল ধর্ম অন্য কোন ধর্ম জরুরী নয়।

জবাব : এসবই পবিত্র কুরআনের ঘোষণার পরিপন্থী ও গর্হিত আকীদা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسلـٰمُ ۗ وَمَا اختَلَفَ الَّذينَ أوتُوا الكِتـٰبَ إِلّا مِن بَعدِ ما جاءَهُمُ العِلمُ بَغيًا بَينَهُم ۗ وَمَن يَكفُر بِـٔايـٰتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَريعُ الحِسابِ (١٩)

“নিশ্চয়ই আল্লাহর দরবারে মনোনীত দ্বীন একমাত্র ইসলাম।”
[সূত্র : সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত ১৯।]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإِسلـٰمِ دينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِى الءاخِرَةِ مِنَ الخـٰسِرينَ (٨٥)

“যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, আল্লাহর দরবারে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।” [সূত্র : সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত ৮৫।]

সুতরাং, উল্লেখিত আকীদা কুরআনের পরিপন্থী হওয়ার কারণে তা কুফরী আকীদা। এ আকীদা নিয়ে যদি কেউ সারা জীবন প্রথম কাতারে নামায পড়ে এবং কোটি কোটি টাকা দান-খয়রাত করে, মানব সেবা করে বা বহুবার হজ্ব-উমরা আদায় করে, তারপরও সবই নিষ্ফল-বেকার গণ্য হবে। ঈমান না থাকার দরুন এসব আমলের কোন বিনিময় সে আল্লাহর দরবারে পাবে না।

ভ্রান্ত আকীদা-৩১ : অধুনা অনেক লোক টুপি, দাড়ি, মিসওয়াক, আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদরাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এগুলোকে খুবই হেয় নজরে দেখে এবং এগুলোকে অনর্থক ও বেকার বলে মনে করে। তারা এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

জবাব : তাদের এ ভূমিকা খুবই মারাত্মক। এ সবই মুরতাদদের কাজ। শরী'আতের কোন বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়- যদিও তা সামান্য কোন আমলই হোক না কেন। যেমন ধরুন, টুপি পরা সুন্নাত, ফরয নয়। কিন্তু কেউ যদি এই সুন্নাত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাহলে সে ঈমানহারা হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। অতএব, এ ব্যাপারে সকলকে সাবধান থাকতে হবে। [সূত্র : শরহে আকায়িদ, পৃষ্ঠা ১৬৭]

ভ্রান্ত আকীদা- ৩২ : অনেক নব্য শিক্ষিত মুসলমান এমন রয়েছে, যারা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে প্রচার করে থাকে যে, মুসলমানদের মুক্তির এখন একমাত্র পথ গণতন্ত্র, অথবা সমাজতন্ত্র, কিংবা অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এ যুগে ইসলামের মতো সেকেলে মতবাদ দিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। তারা আরো বলে থাকে, আলিম সমাজই প্রগতির চাকাকে পিছনের দিকে টেনে রেখেছে। তারাই প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।

জবাব : তাদের এই আকীদা ও বিশ্বাস স্পষ্ট কুফরী আকীদা। [সূত্র : সূরাহ আনআম, আয়াত ১১৬।] কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের কামিয়াবী ও উন্নতির একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ইসলাম। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকা। সেটাকে সেকেলে বলে প্রত্যাখ্যান করা, উলামায়ে কিরামকে হেয় মনে করা এবং গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের মতো কুফরী মতবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করত: তা কায়িমের লক্ষ্যে প্রচার-প্রসার করা স্পষ্ট কুফরী কাজ। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে, উপরোক্ত মতবাদসমূহ জনগণ শোষণের হাতিয়ার। তারা হালাল-হারামের প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে সুদ -ঘুষ ও নানা প্রকার অবৈধ পন্থায় যে উন্নতি করছে, এটাকে প্রকৃত পক্ষে কোন উন্নতি বলা যায় না। এসব মতবাদ গ্রহণ করা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নামান্তর।

আধুনিক যুগের শিক্ষিতরা সভ্যতা, ভদ্রতা ও উন্নতি-প্রগতি বলতে ইংল্যান্ড-আমেরিকা, চীন-জাপানের তথা কথিত সভ্যতা ও উন্নতি-প্রগতি বুঝিয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিতে বেদ্বীনদের ঐ ধরনের সভ্যতা চরম বেহায়াপনা ও নোংরামী, যা জানোয়ার ছাড়া কোন মানুষ থেকে কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, মানুষ

নামের পশুরা এটাকে উন্নতি বললেও আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটা ধ্বংসের রাস্তা। যা কিছুদিন পরে তারাও মানতে বাধ্য হবে। রোম ও পারস্যের অস্তিত্ব বহু পূর্বে শেষ হয়েছে। রুশ-বৃটিশের আগ্রাসী থাবা কিছুদিন পূর্বে যেভাবে শেষ হয়েছে, তেমনিভাবে অবশিষ্ট মোড়লদের ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্মও অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ শেষ হয়ে যাবে। তখন জ্ঞানপাপীদের চক্ষু উন্মোচিত হবে।

ভ্রান্ত আকীদা-৩৩ : বর্তমানে মুসলামানদের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে অনেক খাজাবাবা ও ভান্ডারী দরবার শরীফ-এর ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান হাক্কানী উলামায়ে কিরাম থেকে জিজ্ঞেস না করে দুনিয়ার সকল সুযোগ-সুবিধা ঠিক রেখে অতি সহজে বেহেশত লাভের আশায় তাদের দরবারে ধর্ণা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐসব দুনিয়াদার, ভন্ড, খাজা বাবাদের খপপরে পড়ে নিজের যতুটুকু দ্বীনদারী ও ঈমান-আকীদা ছিল, তাও বিসজর্ন দিয়ে দেয়। ঐসব বাবাদের অনেকে নামায-রোযার কোন ধার ধারে না। [তাদের ভাষায়] তাদের নাকি বাতেনীভাবে ঐসব ইবাদত-বন্দেগী আদায় হয়ে যায়। তাদের দরবারে শিরক-বিদআত ও গান-বাদ্য,বেপর্দা, মদ-গাঁজা ইত্যাদি চলতে থাকে। তারপরও নাকি তারা আল্লাহর বিশিষ্ট ওলী এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী!

জবাব : এ ধরণের বিশ্বাস ও কুফরী আকীদা। কারণ, শরী‘আতের বিধান এই যে, আল্লাহ তা‘আলার হুকুমকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিই একমাত্র আল্লাহর ওলী হতে পারেন।

أَلا إِنَّ أَولِيَاءَ اللَّهِ لا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ (٦٢)

[সূত্র : সূরাহ ইউনুস, আয়াত ৬২।]

যে ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগীর ধার ধারে না, শিরক-বিদ‘আত ও বিভিন্ন হারাম কাজের মধ্যে মশগুল থাকে, সে কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না। চাই সে যতবড় অলৌকিক ঘটনা দেখাক না কেন, বা সে বাতাসে উড়তে সক্ষম হোক না কেন! এসব জিনিস আল্লাহর ওলী হওয়ার কোন দলিল নয়। কিয়ামতের পূর্বে যে ‘কানা দাজ্জাল’ আসবে সেও অনেক আশ্চর্যযজনক ঘটনা মানুষদেরকে দেখাবে। অথচ সে আল্লাহর দুশমন।

[সূত্র : তিরমিযী, খন্ড-২ পৃষ্ঠা -৪৮। মিশকাত শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৭৩।]

এ কথা ঠিক যে, সকলের নিজের আত্মার রোগসমূহের চিকিৎসার জন্যে প্রত্যেকেরই কোন হাক্কানী বুযুর্গের সাহচর্য লাভ করা এবং আত্মার রোগের

চিকিৎসা করা জরুরী। দিলের রোগের চিকিৎসা না করালে, এর একটা রোগের পরিণতিতে সমগ্র জীবনের ইবাদত-বন্দেগী বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের দিন ইখলাসের অভাবে, রিয়ার কারণে সর্বপ্রথম একজন শহীদ, একজন আলিম ও একজন দানশীলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং, এ ব্যাপারে খুবই সর্তক দৃষ্টি রাখা জরুরী। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। দ্বীনদার লোক বলতে যাদেরকে বোঝায়, তাদের থেকেও এটা বিদায় নিয়ে এখন বিলুপ্তির পথে আছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে তিনটি উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তা হচ্ছে-তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়া। এর মধ্যে তাযকিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। [সূত্র : সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ১২৯, সূরাহ জুমুআ, আয়াত-২।] এর জন্যে হাক্কানী বুযুর্গের সাহচর্য লাভ করে আত্মশুদ্ধি করাকে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) ফরযে আইন বলেছেন। [সূত্র : আল ইলুম ওয়াল উলামা, পৃষ্ঠা ১৮৭]

হাক্কানী বুযুর্গের আলামত হযরত থানভী (রহ) 'কসদুস সাবীল' নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি নিম্নরূপ:

ক. যিনি মাদরাসায় পড়ে বা কোন হাক্কানী বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনের ওপর চলার জন্যে প্রয়োজনীয় ফরযে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করেছেন এবং তার প্রত্যেকটি কাজ শরী'আত ও সুন্নাত মুতাবিক।

খ. যিনি কুফর, শিরক, বিদ'আত, হারাম বা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত নন এবং তিনি অর্থলোভীও নন। যেমন, তিনি তার পায়ে মুরীদকে সিজদার অনুমতি দেন না, ওরস করেন না, গানবাদ্য শুনেন না, মদ-গাঁজা পান করেন না, দাড়ি মুন্ডন করেন না বা এক মুষ্টির চেয়ে কম করেন না, মহিলাদেরকে বেপর্দা অবস্থায় মুরীদ করা, বেপর্দাভাবে ঝাড়ফুঁক দেয়া, তাদের সাথে কথা বলা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকেন। এক কথায় শরী'আত ও সুন্নাতপরিপন্থী কোন কাজ তিনি করেন না এবং মুরীদেরকেও করতে দেন না।

গ. সমকালীন যুগের হাক্কানী উলামায়ে কিরাম তাকে হাক্কানী পীর বলে সমর্থন করেন এবং তাকে শ্রদ্ধা করেন। নিজেরা তার নিকট যাতায়াত করেন এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেন ইত্যাদি। ভন্ড খাজাবাবাদের মাঝে এসবের কোন একটি আলামতও পাওয়া যায় না। তাহলে তারা কীভাবে আল্লাহর ওলী হতে পারে?

ভ্রান্তি নিরসন

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সামনে যে দ্বীন পেশ করেছিলেন, তা পরবর্তী উম্মতের নিকট পৌঁছানোর প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন সাহাবায়ে কিরাম (রাযি)। সে হিসাবে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) উম্মতের নিকট দ্বীন পৌঁছার মূলভিত্তি। তাঁদের পর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও পর্যায়ক্রমে সমকালীন যুগের হাক্কানী উলামায়ে কিরামের ওপর। আর সে জন্যেই ইসলাম বিদ্বেষীরা এসব মহামনীষীর পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) ও উলামায়ে কিরাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। যাতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে নানা রকম সন্দেহে-সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম প্রচারের মূলভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই মুসলিম উম্মাহকে এরূপ ভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ‘ভ্রান্তি নিরসন’ নামে নিম্নে পৃথক তিনটি বিষয় সংযোজিত হলো।

ভ্রান্তি নিরসন-১ :

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আল্লাহ তা‘আলা সূরাহ বাকারায় (আয়াত ১৩ ও ১৩৭) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সাহাবায়ে কিরামকে দ্বীন ও ঈমানের কষ্টিপাথর ও নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন-‘আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য’। এদের থেকে তোমরা যাকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াত পেয়ে যাবে।’

[সূত্রঃ মিশকাত শরীফ খন্ড ২, পৃষ্ঠা-৫৫৪]

এ হাদীসটি শব্দের সামান্য পার্থক্য সহকারে অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এসব সূত্রের মধ্য হতে কোনটির শুধু শব্দের ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিস কিছুটা আপত্তি করলেও তারা অর্থের ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নি। অথচ তাদের সে আপত্তিকে না বুঝে অনেকে এতদসম্পর্কে বর্ণিত সকল সূত্রকে বাতিল বলে প্রচার করে। এটা তাদের চরম মূর্খতা। কোন একটা সূত্রের উপর আপত্তির কারণে অবশিষ্ট সবগুলো সূত্র কখনো বাতিল হতে পারে না। তেমনিভাবে অবশিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসসমূহও বানোয়াট হওয়া প্রমাণিত হয় না।

যা হোক, নমুনাস্বরুপ কয়েকটি আয়াত ও হাদীস ও পেশ করা হয়েছে, যার সারমর্ম হলো, সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠিস্বরুপ। তারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। ঈমানের সাথে একবার যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন, এবং ঈমানের সাথেই ইনতিকাল করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল ওলী-বুযুর্গ মিলে তার সমতুল্য হবেন না। সুতরাং, এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, তাদের মর্যাদা কত অধিক!

অপরদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাদের সম্পর্কে বিরুপ মনোভাব পোষণ করা কিংবা তাদের বিরুপ সমালোচনা করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন- "আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" আমার ইনতিকালের পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসবে। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিল, তার গ্রেফতারী অতি নিকটেই। [সূত্র : মিশকাত শরীফ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫৪।]

এর দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবীগণের সমালোচনার করা কত বড় মারাত্মক অপরাধ! যে ব্যক্তি সাহাবীগণের সমালোচনার করলো, সে এটা প্রমাণ করে দিল যে, তার অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষ আছে। আর সেটার বহিঃপ্রকাশের জন্যেই সে সাহাবীগণের সমালোচনার পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাজত করুন।

অপর একটি হাদীসে নবী পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "তোমরা যখন কাউকে সাহাবীগণের সমালোচনা করতে দেখ, তখন বলে দাও যে, তোমাদের ও সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তাদের ওপর অর্থাৎ সমালোচনাকারীদের ওপর আল্লাহর লানত।"

[সূত্র : মিশকাত শরীফ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫৪।]

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, একদিকে সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি। অপরদিকে তাদের সমালোচনা করা হারাম, অনেক ক্ষেত্রে কুফরও বটে। আর তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও ভালোবাসা ঈমানের অংশ। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাগুলো তাদের মাধ্যমেই উম্মতের নিকট এসে পৌঁছেছে। এসব দিক লক্ষ্য করেই উলামায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যে ইতিহাস মানুষ কর্তৃক রচিত, এর মধ্যে আবার অনেকগুলোই ইসলামের দুশমনদের দ্বারা লিখিত। সুতরাং, এসব ইতিহাস নির্ভর তথ্যের ওপর যাচাই-বাছাই ছাড়া পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করা অসম্ভব। তাই ইতিহাসের যে অংশটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সংঘাতপূর্ণ নয় এবং সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, শুধুমাত্র ততটুকুই গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট অংশ কোনক্রমেই গ্রহণ করা হবে না।

ঈমান-আকীদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র এরই ওপর পরকালে মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। সুতরাং, ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে ঈমানের ওপর আচড় আসতে দেওয়া কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে শোভা পায় না। ফলতঃ সাহাবীগণ নির্ভরযোগ্য গণ্য না হলে সম্পূর্ণ দ্বীনের বুনিয়াদই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ আমরা দ্বীন পেয়েছি সাহাবীগণের মাধ্যমেই।

কেউ বলতে পারেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত মা'য়িম (রাযি)এর দ্বারা যিনা সংঘটিত হওয়া এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করার ঘটনা উল্লেখ আছে। তেমনিভাবে অপর এক সাহাবীর মদ্যপান এবং তাকে শাস্তিদানের কথা উল্লেখ আছে। আর উভয় ঘটনাই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে সাহাবীগণ কীভাবে সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন? তাছাড়া তাদের দ্বারাই তো সংঘটিত হয়েছে জংগে জামাল, জংগে সিফফীন এর ন্যায় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। তাহলে তাদেরকে কিভাবে সত্যের মাপকাঠিরূপে মেনে নেওয়া যায়? তাদের এরূপ মন্তব্যের উত্তরে উলামায়ে কিরাম বলেন :

ক. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো সাহাবীগণ মাসুম বা নিষ্পাপ নন। তবে দ্বীনের জন্যে অকল্পনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর কারণে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাগফিরাত ও জান্নাত প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন।

وَالسّٰبِقونَ الأَوَّلونَ مِنَ المُهٰجِرينَ وَالأَنصارِ وَالَّذينَ اتَّبَعوهُم بِإِحسٰنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضوا عَنهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنّٰتٍ تَجرى تَحتَهَا الأَنهٰرُ خٰلِدينَ فيها أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ (١٠٠)

[সূত্র : সূরাহ তাওবা, আয়াত -১০০]

সুতরাং, তারা মাসুম না হলেও নিঃসন্দেহে তারা মাগফিরাতপ্রাপ্ত ও জান্নাতী। তাই পরবর্তীদের জন্যে শুধু তাদের ভালো আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; সমালোচনার অনুমতি কোনক্রমেই দেওয়া হয়নি। এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রত্যেকে নিজের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, সে দ্বীনের জন্যে কতটুকু কুরবানী করেছে। নিজেকে কতটুকু গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রতি নিয়ত যে ব্যক্তি ভুল করেই চলেছে, তার জন্য কি মাগফিরাতপ্রাপ্ত জান্নাতী মানীষীবৃন্দের সমালোচনা করা শোভা পায়? দ্বীন বুঝতে বা কায়িম করতে কি এ ধরণের আলোচনার কোন প্রয়োজন পড়ে? আর যদি তা না-ই হয়, তাহলে কোন প্রয়োজনে তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো? সমুদ্রে নাপাক পড়লে, পেশাব পড়লে যেমন সমুদ্র নাপাক হয় না, বরং নাপাক তার অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সাহাবীগণ তাদের অসাধারণ কুরবানীর বদৌলতে ছিলেন নেকীর সমুদ্র। সুতরাং তাদের দু'একজনের জীবনে যদি অসাবধনতা বশত দু'একটি গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সে কারণে তাদের সমগ্র জীবনের কুরবানী থেকে চক্ষু বন্ধ করে তাদের সমালোচনা করা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

খ. লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের (রাযি) মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যদি কোন গুনাহ করে ফেলেন, তাহলে তাতে কি এ বিশাল জামাতের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে কি তাদের সত্যের মাপকাঠি ও উম্মতের পথপ্রদর্শক হওয়া বাতিল হয়ে যায়? দু'একজন থেকে যে ভুল হয়েছে, তাতো হাদীসে ভুল হিসেবে বা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিতই করা হয়েছে। সুতরাং সেই ভুলের বিষয়ে তাদেরকে অনুকরণ বা অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। আর এরূপ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে তো কত হিকমত নিহিত রয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল শুধু আল্লাহর আহকাম বর্ণনা করার জন্য নয়; বরং প্রত্যেক আহকামের বাস্তবরূপ উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই খোদা না করুন, যদি কোন রাষ্ট্রে ইসলামী হুকমত কায়িম থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির থেকে যিনা বা মদপানের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তা প্রমাণ করার পদ্ধতি এবং অপরাধ

প্রমাণিত হলে তার শাস্তি প্রয়োগের নিয়ম কি হবে, এটা উম্মতের সামনে আসার জন্য এরূপ দু'একটি ঘটনা পথ নির্দেশনারই শামিল। তাছাড়া একজন মুমিন থেকে যদি ভুলক্রমে বা শয়তানের প্রবঞ্চনায় গুনাহ হয়ে যায়, তখন সেই ঈমানদারদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, এবং গুনাহ থেকে নিজেকে পাক-পবিত্র করার জন্যে কতটুকু পেরেশান হওয়া উচিত, এরও একটা নমুনা সেই ঘটনাসমূহ দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য করলে এরূপ দু'একটি ঘটনার হিকমত বোঝা যায় এবং একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঐ ভুলের ব্যাপারে উম্মত তাদের অনুকরণ করবে না বটে, কিন্তু ঐ অবস্থায় তার মানসিক অবস্থা ও খোদার প্রতি ভয়-ভীতি কিরূপ প্রকাশ পাওয়া উচিত, সে ব্যাপারে উক্ত সাহাবী তার জন্যে দৃষ্টান্ত এবং অনুকরনীয় হবেন। সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহর কাজের মধ্যে কত হিকমত থাকতে পারে! হযরত মা'য়িয (রাযি) থেকে যিনা হওয়ার পর তিনি নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন 'হে আল্লাহর নবী! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি । আমাকে পবিত্র করুন!' অথচ তিনি নিজে না বললে এ ঘটনা প্রকাশ পেত না। একমাত্র খোদার ভয়ে তিনি এত পেরেশান হয়েছিলেন যে, নিজেকে পাক-পবিত্র করার জন্যে নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন মা'য়িয তুমি হয়তো তাকে স্পর্শ করেছ বা চুমো দিয়েছ? তিনি বললেন-না, আমি যিনাই করে ফেলেছি। চারবার স্বীকারোক্তির পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সঙ্গেসার করার বা পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি অপরাধ করেছিলেন এ কথা ঠিক, কিন্তু তারপরও তিনি আমাদের ন্যায় অপরাধকারী সকল উম্মতের জন্যে গুনাহ মাফ করানোর ব্যাপারে নমুনা বা আদর্শ হয়ে আছেন।

গ. সাহাবা (রাযি) কর্তৃক জংগে জামাল, জংগে সিফফীন সংঘটিত হয়েছিল- একথা ঠিক, কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে যে, তারা ক্ষমতা দখলের জন্য বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থে এসব যুদ্ধ করেছিলেন? এ সম্পর্কে যাদের যথার্থ জ্ঞান রয়েছে, তারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, উভয় জামা'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর বিধান কায়িম করা। আর এ জন্যে তারা সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণের উভয়

জামা'আতের মাঝে মুনাফিক 'আবদুল্লাহ বিন সাবা'র বাহিনী এমনভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল, যা থেকে পরিত্রান পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সারকথা, সাহাবীগণের উভয় দলের মধ্যে কোন দলই দুনিয়াবি স্বার্থে এসব যুদ্ধ করেন নি। উভয় দলেরই উদ্দেশ্যই ছিল দ্বীন। আপাতদৃষ্টিতে একদলের সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হলে, অপর দলের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে সমালোচনা করা যাবে না। কারণ এটা ভুল গণ্য হলেও তা ছিল ইজতিহাদী ভুল-যা ক্ষমার্হ। এ কারণে উভয় জামা'আত থেকে যারা সেসব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাদের সকলকে শহীদ বলা হয় এবং বহু বছর পর বিশেষ কারণে যখন তাদের কবর খনন করা হয়, তখন তাদের লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

[সূত্র : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫৯।]

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে এটা শাহাদাতের আলামত। তাদের এই শাহাদত প্রমাণ করে যে, তারা দুনিয়ার লোভে এসব যুদ্ধ করেন নি। বরং দ্বীনের জন্যে করেছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব ঘটনা আল্লাহ তা'আলার ইলমে অবশ্যই ছিল এবং সামনে রেখেই তিনি সাহাবীগণের ব্যাপারে রাজি হওয়ার এবং তাদের জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই মহান সাহাবীগণের সমালোচনা ও দোষচর্চার কি অধিকার থাকতে পারে? প্রত্যেকে যদি নিজের দোষ সংশোধনের চিন্তা করে, তাহলে কেউ এমন মহান ব্যক্তিবর্গের দোষচর্চা তো দূরের কথা, একজন সাধারণ ও নিম্নস্তরের মুসলমানের দোষচর্চায়ও লিপ্ত হতে পারে না। উপরন্তু এরূপ আলোচনা 'গীবত' হওয়ার কারণে শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। যারা নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, নিজের ঈমান-আকীদার খবরও যাদের কাছে নেই, তারাই এরূপ হারামে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে।

প্রত্যেকে নিজের বাপ-দাদার ব্যাপারে কত হুঁশিয়ার! কেউ তার বাপ-দাদার অন্যায় সমালোচনা বরদাশত করতে পারে না। অথচ সাহাবীগণের ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ করা আমাদের পিতা-মাতা ও দাদা-নানার

ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণের চেয়েও লক্ষ-কোটি গুণ বেশি জরুরী। মুসলমান হয়েও কিভাবে সাহাবীগণের দোষচর্চা করতে পারে, বা দোষচর্চা শুনে বরদাশত করতে পারে, তা বোধগম্য নয়।

ভ্রান্তি নিরসন-২ :

বর্তমানে অনেক নব্যশিক্ষিত লোক আলেম সমাজের বিরুদ্ধে বুঝে না বুঝে তাদের গুরুদের অনুকরণে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কর সমালোচনা করে থাকে। অথচ উলামায়ে কিরাম দ্বীনের কাজ করছেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়ারিশ, তাই তাদেরকে গালি দেওয়া, তাদেরকে হেয় করা, তাদের সমালোচনা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কুফরী কাজ। এতে ঈমান চলে যায়। আর ঈমান চলে গেলে অতীত জীবনের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুর পর কবরে তাদের চেহারা কিবলার দিক থেকে আপনা আপনি অন্য দিকে ফিরে যাবে বলে হাদীসে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাযত করুন। তাদের সেই অভিযোগ মূলত ভ্রান্তিপ্রসূত। সেই ভ্রান্তি নিরসনে তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের জবাব নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমরা অভিযোগগুলো উল্লেখপূর্বক তার জবাব এজন্যে প্রদান করছি, যাতে করে তাদের অভিযোগের যবনিকাপাত হয় এবং এরদ্বারা আলেম সমাজের দোষারোপ করা থেকে দূরে থেকে সরল প্রাণ মুসলমানগণ নিজেদের ঈমান বাঁচাতে পারেন।

প্রথম অভিযোগ : তারা অভিযোগ করে, উলামায়ে কিরাম মাদরাসার মধ্যে শুধু কুরআন-হাদীস কেন শিক্ষা দেয়? এর সাথে বিভিন্ন রকম কারিগরি বা হস্ত শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিতে তাদের বাধা কোথায়?

জবাব : অভিযোগকারীরা মূলত কওমী মাদরাসায় শিক্ষার লক্ষ্যে-উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বে-খবর। এজন্য তাদের মধ্যে এই আপত্তি উঠেছে। তাহলে শুনুন, দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক দ্বারা পরিচালিত না হলে দুনিয়াতে কোন জিনিসই ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে না। বরং কিছুদিন পরেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।। দ্বীন ইসলাম মানবজাতির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াও আখিরাতের কামিয়াবির জন্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। সুতরাং, এ নেয়ামতের

স্থায়ীত্বের জন্যে প্রত্যেক জামানায়, প্রত্যেক এলাকায় বিজ্ঞ ও পারদর্শী হাক্কানী উলামায়ে কিরামের বড় একটি জামাত বিদ্যমান থেকে সহীহভাবে দ্বীনের সকল বিভাগে খিদমত আনজাম দেওয়া জরুরী। কওমী মাদরাসারগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম মিল্লাতের এ দ্বীনি দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য হাক্কানী ও আল্লাহওয়ালা বিজ্ঞ উলামা দল সৃষ্টি করা, যাতে দ্বীন ইসলামের স্থায়িত্ব ও প্রচার প্রসারে এবং মুসলামানদের দ্বীনি প্রয়োজন মিটাতে কোন ক্ষেত্রে কোন রকম সমস্যার সৃষ্টি না হয়। আল-হামদুল্লিলাহ, এ লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কওমী মাদরাসাসমূহ নীরব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারই বদৌলতে চরম ফিতনার এ যুগে এখনো মুসলমানগণ সহীহ দ্বীন- ঈমান নিয়ে টিকে আছেন। এখন যদি কওমী মাদরাসাসমূহের সিলেবাসে হস্তশিল্প, কারিগর প্রশিক্ষণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আর বিজ্ঞ পারদর্শী উলামা সৃষ্টি হবে না। যেমন সরকারী মাদরাসা থেকে হচ্ছে না এবং এটা কখনো সম্ভব নয়। কারণ, কুরআন হাদীসের জ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর। প্রখর ছাত্র যদি একনিষ্ঠভাবে এই জ্ঞান অধ্যয়ন করে, তাহলে সে এটা আয়ত্বে আনতে পারবে। কিন্তু দ্বীনি ইলমের সাথে দুনিয়াবি বিষয়ের মিশ্রণ ঘটালে, তার পক্ষে আর কোনভাবেই এটা সম্পূর্নরূপে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। কথায় বলে, ‘তোলা দুধে পোলা বাঁচে না।’ সুতরাং তখন যেসব নামকে ওয়াস্তে আলেম তৈরী হবে, তাদের দ্বারা দ্বীন ইসলাম টিকে থাকবে না এবং তাদের থেকে জনগণ সহীহ দ্বীনও পাবে না। তাই দ্বীন রক্ষার স্বার্থেই কওমী মাদরাসা কুটির শিল্প, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রভৃতি প্রবেশ করানো হয় না।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে অভিযোগকারীদের নিকট আমাদের প্রশ্ন যে, আপনারা এ ধরণের প্রস্তাব কেন দিচ্ছেন না যে, মেডিকেল কলেজে শুধু ডাক্তার তৈরী করা হচ্ছে কেন? সেখানে কিছু কমার্সের সাবজেক্টও ঢুকানো হোক। যাতে তাদের মধ্যে দু ধরণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ- ইউনিভার্সিটিগুলোতে মেডিকেল সায়েন্স প্রবেশ করানো হোক। যাতে করে তারা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তারও হতে পারে। ফলে তারা জাতির জন্যে দ্বিগুণ খিদমত আনজাম দিতে পারবে।

আজ পর্যন্ত কোন পাগলও এ ধরণের চিন্তা করেছে কি? নিশ্চয়ই নয় কারণ কী? কারণ এটাই যে, এতে দুটোর কোনটাই ভালোভাবে শিক্ষা লাভ করা যাবে না। তাহলে মাদরাসার ব্যাপারে আপনাদের এ ধরণের বেওকুফি প্রস্তাব কেন?

আসল কথা হচ্ছে, সেই অভিযোগকারীরা দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। জেনে রাখুন, সকলের জন্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেকের ওপর ফরয। প্রত্যেক মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অর্থনীতিবিদের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরয। কিন্তু কোন আলেমের জন্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরী নয়, বরং এটা সমীচীনও নয়। কারণ দুই লাইনের খিদমত কেউ কখনো একসঙ্গে আনজাম দিতে পারবে না। যে কোন একটা পূর্ণভাবে পাঠ করলে, অন্যটা বাদ পড়তে বাধ্য। সুতরাং উলামায়ে কিরামকে এ ধরণের অনর্থক পরামর্শ না দিয়ে তারা যদি স্কুল-কলেজে গিয়ে সেখানকার সিলেবাসে ফরযে আইন পরিমাণ ইলমে দ্বীন শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেন তাহলে সেটা হবে সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতির কল্যাণ কামনা। তাতে মুসলিম ছেলেদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত হবে। মুসলিম সন্তানরা খৃষ্টানী ও হিন্দুয়ানী কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত বা প্ররোচিত না হয়ে ইসলামের দিকেই ধাবিত হতে থাকবে। বর্তমানে যে মুসলমান ও হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, মুসলমান ও নাস্তিকের মাঝে হারামভাবে বিয়ে-শাদী হচ্ছে, তা দ্বীনি ইলম বিবর্জিত ভ্রান্ত শিক্ষানীতিরই কুফল। কোন জাতির শিক্ষানীতি যদি ভ্রান্ত হয় এবং শিক্ষার নামে কুশিক্ষা চলতে থাকে, তাহলে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই জাতিকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হোন এবং উলামায়ে কিরাম সম্পর্কে অযৌক্তিক চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুন।

দ্বিতীয় অভিযোগ : আলেমগণ শুধু মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ আর ওয়াজ-নসিহত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কেন? তারা কি জাতির জন্যে কিছু খিদমত আনজাম দিতে পারে না? তারা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন অফিস-আদালতে ব্যবসা-বাণিজ্যে, মিল-ফ্যাক্টরীতে শ্রম দিতে পারতেন! তাতে জাতির অনেক উপকার হতো।

জবাব : কিছু লোক কওমী মাদরাসায় পড়ে দ্বীনি লাইনে পারদর্শী হয়েছেন, আলেম হয়েছেন, তেমনি আরো কিছু লোক জেনারেল লাইনে পড়ে পারদর্শী হয়ে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি ডিগ্রি অর্জণ করেছেন। এখন কি কেউ প্রশ্ন তুলবে যে, ডাক্তাররা শুধু হাসপাতালে আর ক্লিনিকে কেন ব্যস্ত থাকবে? তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে, মিল-কারখানায় শ্রম দিলে তো জাতির অনেক উপকার হতো! নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন কেউ করবে না। কারণ, ডাক্তার এই কাজ শুরু করলে জাতি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। ঠিক তেমনিভাবে উলামায়ে কিরাম যদি মিল-ফ্যাক্টরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে জাতি বিনা হিদায়াতে ঈমানহারা হবে। তারা ইলমে দ্বীনের সেবা থেকে বঞ্চিত হলে, নিঃসন্দেহে বিপদগামী হয়ে জাহান্নামের পথে অগ্রসর হবে। জাতিকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতেই আলেম-উলামাগণ দ্বীনের যিম্মাদারী নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

তদুপরি আলেমগণ জাগতিক উন্নতির মাধ্যমও বটে। কারণ, একটি হাদীসে পাকের সারকথা হলো. ‘কিছু লোক যে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদেরকে উসিলা করে আল্লাহ তা‘আলা সকলকে প্রতিপালন করছেন ’ অন্য এক হাদীসের সারমর্ম হলো, ‘আলেম ও তালেবে ইলমের মাধ্যমে দ্বীন টিকে থাকার ওপরই জগতের স্থায়ীত্ব নির্ভরশীল।’ বলা বাহুল্য, আলেম-উলামা ও তালিবে ইলমদের দ্বীনি খিদমতের বদৌলতেই আল্লাহ তা‘আলা জমিনে ফসল দিচ্ছেন, ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বরকত দিচ্ছেন, কল-কারখানায় উন্নতি দান করছেন। এক কথায় চীন, রাশিয়া, জাপান, জামার্ন, ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ সারা বিশ্ব টিকে আছে উলামায়ে কিরামের দ্বীনি খিদমতের উসিলায়। যেদিন এ দ্বীনি খিদমত বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন দুনিয়া আর টিকে থাকবে না। বরং সেদিন মহাপ্রলয় বা কিয়ামত সংঘটিত হয়ে সব ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

তাছাড়া আরো লক্ষ্য করুন, সংসদ সদস্যগণ মিল-ফ্যাক্টরীতে যোগদান করলে যেমন দেশ চলবে না, তেমনিভাবে উলামায়ে কিরাম জনগণের দ্বীনি খিদমত বাদ দিয়ে দুনিয়াবি কাজে লাগলে দুনিয়াও অচল হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা মুসলমান, কুরআন-হাদীস স্বীকার করেন, তাদের সম্বিৎ ফেরাবার

জন্যে আমরা এসব কথা পেশ করলাম। শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণকারী অবাধ্য নাস্তিক-মুরতাদের সাথে আমাদের কোন তর্ক-বির্তক নেই।

তৃতীয় অভিযোগ : আলেম সমাজ পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকা পছন্দ করেন কেন? তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে বা দুনিয়াবী অন্য কোন পেশা অবলম্বন করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলতে পারেন না?

জবাব : দুনিয়াবি শিক্ষায় পারদর্শী ও বড় বড় ডিগ্রিধারী লোকেরা অনেক শ্রম, সময় ও পয়সা ব্যয় করে বিভিন্ন লাইনে পারদর্শী হয়ে সেই লাইনে জাতির সেবা করছেন এবং জাতির নিকট থেকে তার বিনিময় গ্রহণ করে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছেন। এটাই সমগ্র বিশ্বের একটা সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেকে তার লাইন অনুযায়ী জাতিকে সেবা করে বিনিময় গ্রহণ করবেন-এর মধ্যে দোষের কিছু নেই এবং এ জন্যে যারা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে কেউ পরজীবী বলে না। তাহলে প্রশ্ন হলো, উলামায়ে কিরাম সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং তাদের দক্ষতা অনুযায়ী জনগণের দ্বীনি সেবা ও খিদমতের জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, এর বিনিময় হিসাবে জনগন থেকে হালালভাবে কোন পারশ্রমিক গ্রহণ করলে, কেন তাদেরকে পরজীবী বলা হবে? কওম ও জাতির পক্ষ থেকে এটা কি আলেম সমাজের প্রতি দয়া বা করুণা? তারা কি জাতির কম গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিচ্ছেন? নাকি অল্প পরিশ্রমে অধিক বিনিময় গ্রহণ করছেন? বরং আলেমগন জাতির বিরাট খিদমত আনজাম দিচ্ছেন। দুনিয়াও আখিরাতের কল্যাণের রাস্তা একমাত্র উলামায়ে কিরামই দেখাচ্ছেন। মানুষকে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের যোগ্য হওয়ার পথ প্রদর্শন করেছেন। তাছাড়া দুনিয়াতে এখনো লজ্জা-শরম বিবাহ-শাদী, পাক-পবিত্রতা, আমানতদারি-সততা যতটুকু বিদ্যমান আছে, তা একমাত্র উলামায়ে কিরামেরই অবদান। এর চেয়ে বড় খিদমত আর কি হতে পারে? এর তুলনায় অন্যদের যতরকম ক্ষণস্থায়ী ও নগণ্য খিদমতের কতটুকু মূল্য আছে? উলামায়ে কিরাম যথেষ্ট শ্রম দিয়ে কেবলমাত্র জীবনধারণ উপযোগী স্বল্প পারিশ্রমিক গ্রহণ করছেন। তাঁরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষকদের তুলনায় অতি সামান্য বিনিময় নিয়ে থাকেন। তারপরও অযথা এ আপত্তি কেন?

আলেমগণের সম্পর্কে এ ধরণের অভিযোগ উত্থাপন জাতির জন্যে বড়ই পরিতাপের বিষয়। এর দ্বারা দ্বীনের কাজের গুরুত্বকে ছোট নজরে দেখা হয়, যা ঈমানের জন্যে ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সহীহ ও সঠিক বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

ভ্রান্তি নিরসন-৩ :

অনেকে বলে থাকে যে, শুনেছি, হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'টি কিতাব বা দফতর আছে। তার একটির মধ্যে শুধু জান্নাতীদের নাম আছে। আর অপরটির মধ্যে আছে জাহান্নামীদের নাম এবং উভয় খাতার নামগুলো যোগ করে মোটসংখ্যা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কোন হেরফের বা কমবেশি হবে না। তাহলে প্রশ্ন হয়ে যে, সবকিছু যদি আগেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কষ্ট করে আর আমল করার প্রয়োজন কি? তাছাড়া আমল করেই বা লাভ কী? ফায়সালা তো আগেই হয়ে গেছে।

জবাব : আপনি যে হাদীসটি শুনেছেন, তা সহীহ ও সঠিক। হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে উল্লেখিত হাদীসটির ব্যাপারে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা উচিত নয়। কারণ তাকদীরের ব্যাপারে নিজের আকল-বুদ্ধি দ্বারা গবেষণা করা বা তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হওয়া অথবা বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা শরী'আতে নিষেধ। একথা ঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা তার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ইলমের দ্বারা লিখে রেখেছেন যে, নিজের এখতিয়ার অনুযায়ী আমল করে কোন বান্দা জান্নাতের বাসিন্দা হবে, আর কোন বান্দা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। তবে তিনি এরুপ কেন লিখে রেখেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। এর মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। আমাদের শুধু এতটুকুই জানতে হবে যে, এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? এর চেয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে বান্দার যিম্মাদারী হলো, আল্লাহ তা'আলার এই ফায়সালার ওপর ঈমান আনা এবং বাস্তবিক পক্ষে যে দু'টি কিতাব তৈরী আছে, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। এতটুকু করলে আমাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল। এর ওপর ভিত্তি করে আমল না করা বা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব বহির্ভূত বা অনধিকার চর্চার শামিল।

সারকথা, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, উক্ত দুই কিতাবের ওপর ঈমান রাখা এবং নিজের ইখতিয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম ও বিধি নিষেধ

বাস্তবায়ন করা। কারণ, উক্ত কিতাবদ্বয়ে কী লেখা আছে, তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া সেই লেখা দ্বারা আমাদের ইখতিয়ার ও শক্তি তো নষ্ট হয়ে যায় নি! সুতরাং, কিতাবে যা-ই লেখা থাকুক, আমাদের আমল করে যেতে হবে। এটাই বান্দার বন্দেগী ও তার দায়িত্ব। এরই মধ্যে তার সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। উক্ত হাদীস শুনে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) ও একই প্রশ্ন করেছিলেন। তার জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভরসা করে বসে না থেকে আমল করতে বলেছিলেন। কারণ আমল বান্দার ইখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।
উক্ত কিতাব দুটি সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে- আশা করা যায় যে, এর দ্বারা বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন, একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বাদশাহের দরবারে বিভিন্ন লোকের যাতায়াত ও যোগাযোগ আছে। কেউ বাদশাহকে দ্বীনি ব্যাপারে সহযোগীতা করতে আসেন এবং তার দ্বীনদারীর কারণে বাদশাহ তাকে মুহাব্বত ও শ্রদ্ধা করেন। আবার অনেকে নিজের হীন স্বার্থ আদায়ের জন্যে বাদশাহের প্রতি বাহ্যত মুহাব্বত প্রদর্শন করবেন। এক সময় বাদশাহ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, প্রকৃত বাদশাহপ্রেমীদের পুরুষ্কৃত করবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, নকল মুহাব্বতকারীরা দুর্নাম রটাবে যে, বাদশাহ মহোদয় আমাদের প্রতি ইনসাফ করলেন না। বাস্তবে আমরাও তাকে ভালোবাসি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে পুরুষ্কার না দিয়ে অন্যদেরকে দিলেন। এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্যে বাদশাহ একটা হিকমত অবলম্বন করলেন। বাদশাহ বললেন-১ম দফতরে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি পুরুষ্কৃত করব। আর ২য় দফতরে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি শাস্তি প্রদান করব এবং উভয় দফতর চূড়ান্ত করে শেষে মোটসংখ্যা লিখে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, এর মধ্যে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। বাদশাহের এই ঘোষনার পর প্রকৃত বাদশাহপ্রেমীগণ তাদের আচার-আচরণ ও দরবারে যাতায়াতের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করলেন না। তারা বললেন যে, আমরা আল্লাহর সুন্তুষ্টির জন্যে এই আল্লাহওয়ালা বাদশাহকে মুহাব্বত করছি এবং তার কাজে সহযোগিতা করছি। সুতরাং, আমরা নেক কাজ করেই যাব। চাই বাদশাহ আমাদেরকে পুরষ্কৃত করুন বা শাস্তি প্রদান করুন, এটা বাদশাহের

নিজস্ব ব্যাপার। আর স্বার্থান্বেষী মহল বাদশাহের ঘোষণার পরে বাদশাহের দরবারে আসা-যাওয়া ও সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিল। তারা বলতে লাগলো যে, দুটি দফতর যখন তৈরী হয়ে গেছে, তাহলে এখন দরবারে যাতায়াত বৃথা। কারণ, প্রথম দফতরে নাম থাকলে সর্বাবস্থায় পুরুষ্কার পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় দফতরে নাম থাকলে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সুতরাং দররবারে যাওয়া না যাওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই দরবারে গিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের কাজ করাই ভালো। এর পরে নির্দিষ্ট তারিখে দেখা গেল যে, যারা দফতরের ওপর ভরসা করে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল তারা তাদের অপরাধের শাস্তি পেয়েছে। আর যারা দফতরের ওপর নির্ভর না করে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে, তারা সকলেই তাদের খালেস মুহাব্বতের কারণে পুরষ্কৃত হয়েছেন। এটা হলো উপরোক্ত বিষয়ের একটি উদাহরণ। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহ তা'আলার দুই কিতাবের স্বরুপ উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা রুহের জগতে প্রথম যখন সকলকে জমা করেছিলেন, তখনই নিজের ইলম মুতাবিক এক দলকে জান্নাতে, আরেক দলকে জাহান্নামে পাঠাতে পারতেন, কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির-মুশরিকদের আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সুযোগ থাকতো যে, আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে আমল করার সুযোগ দিলে আমরা অন্যদের থেকে বেশি আমল করতাম। কিন্তু আল্লাহ তো আমাদেরকে সুযোগই দিলেন না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম দ্বারা ফায়সালা না করে সকলকে আমলের সুযোগ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং উভয় দফতরের কথা ঘোষণা করেছেন। এখন দুনিয়াতে যারা দফতরের ওপর ঈমান তো রাখবে, কিন্তু দফতরের ভরসায় আমল পরিত্যাগ করবে না, হাশরের ময়দানে দেখা যাবে যে, শুধু তাদেরই নাম জান্নাতী দফতরে লেখা আছে। আর যারা দফতরের ওপর নির্ভর করে আমল করেনি, দুনিয়ার ব্যাপারে তারা খুব বুদ্ধিমান হলেও আখিরাতের বিষয়ে বড়ই অলস । অথচ যুক্তি-তর্কে খুব পারদর্শী। হাশরের ময়দানে দেখা যাবে যে, এমন লোকগুলোর নাম জাহান্নামের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর ও কিতাবদ্বয়ের ওপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না, বরং আমল করতে থাকতে হবে। তাহলেই পরকালে জান্নাত লাভে সক্ষম হওয়া যাবে।

অধ্যায় চার

কুফর, শিরক, গুনাহে কবীরা ও বিদ‘আতের বর্ণনা

ঈমান অপেক্ষা মূল্যবান রত্ন ও অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জগতে আর নেই। মনে–প্রাণে এ অমূল্য রত্নের হেফাযত করা আবশ্যক এবং এর প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে প্রাণের চেয়েও অধিক মুহাব্বত করা উচিত।

প্রথম অধ্যায়ে বর্নিত আকীদাগুলো হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ঈমানের ৭৭ শাখা হাসিল করলে, ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় হবে। আর কতগুলো জিনিস এমন আছে যে, তাতে ঈমান নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তার কিছু বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, আখিরী জামানায় ঈমান রক্ষা করা কঠিন হবে। তথাপি সাবধান! জীবন দিয়ে হলেও প্রত্যেক মু‘মিনকে তার ঈমানের হেফাযত করতেই হবে। ঈমান চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন– ‘যারা সরল পথ [ইসলামের শিক্ষা] প্রকাশ পাওয়ার পর রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুসলমানের তরিকা ছাড়া অন্য তরীকা অবলম্বন করবে, আমি তাদেরকে সেই পথগামীই করব এবং পরিণামে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। জাহান্নাম ভীষণ মন্দ জায়গা। আল্লাহর সঙ্গে শরিক করার পাপ কিছুতেই আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্যে যতটুকু ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে, তারা মহাপাপী। তারা আল্লাহকে ছেড়ে স্ত্রী জাতির অর্থাৎ দেবীদের এবং খোদার অভিশপ্ত সেই পাপিষ্ঠ শয়তানেরই পূজা করছে, যে মানবজাতির সৃষ্টির লগ্নে বলেছিল– আমি মানবজাতির মধ্য হতে এক দলকে নিজের অনুসারী বানিয়ে

তাদেরকে বিপথগামী করব, তাদেরকে নানা দুরাশায় আক্রান্ত করব, আর তাদেরকে গৃহপালিত পশুর কান কাটতে আদেশ করব। আর তা-ই করবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে [অর্থাৎ শ্মশ্রুমুণ্ডণ বা দাড়িমুণ্ডণ ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কাজ করতে] আদেশ করব, তারা তাই করবে। বস্তুত যারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের আদেশ পালন করবে, তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শয়তান তাদের নিকট ওয়াদা করে এবং আশ্বাস বাণী শোনায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তানের ওয়াদা ও আশ্বাস বাণী প্রবঞ্চনা ব্যতীত কিছুই নয়"।

وَالّٰتى يَأتينَ الفٰحِشَةَ مِن نِسائِكُم فَاستَشهِدوا عَلَيهِنَّ أَربَعَةً مِنكُم ۖ فَإِن شَهِدوا فَأَمسِكوهُنَّ فِى البُيوتِ حَتّىٰ يَتَوَفّىٰهُنَّ المَوتُ أَو يَجعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلًا (١٥)
وَالَّذانِ يَأتِيٰنِها مِنكُم فَـٔاذوهُما ۖ فَإِن تابا وَأَصلَحا فَأَعرِضوا عَنهُما ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوّابًا رَحيمًا (١٦)

[সূত্র : সূরাহ নিসা, আয়াত ১৫-১৬।]

শিরক, বিদ'আত, জাহিলিয়্যাতের রসম ও শয়তানের পায়রবি যে কত জঘন্য অন্যায়, নিন্দনীয় এবং ঈমানের জন্যে অনিষ্টকর, উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এসব কাজ করলে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা নষ্ট হয় এবং ইমানের নূর ও রশ্মি চলে গিয়ে তথায় অন্ধকার বিস্তার লাভ করে। তাই ঈমানের বিষয়াবলী ও ইসলামী আকায়িদ বর্ণনা করার পর সাধারণের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন বদ রসম ও বড় বড় গুনাহ [গুনাহে কবীরা] বর্ণনা করে দেওয়া সমীচীন মনে করছি। ঈমানদারগণ উক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে জেনে সেগুলো হতে বিরত থেকে নিজ নিজ ঈমানের হেফাযত করতে চেষ্টা করবেন বলে আশা করি।

প্রচলিত বদ রসমসমূহের মধ্যে কতগুলো কুফর ও শিরক পর্যায়ের, আর কতগুলো কুফর ও শিরক তো নয়, কিন্তু কুফর ও শিরকের কাছাকাছি, আর কতগুলো বিদ'আত ও গোমরাহী এবং কতগুলো হরাম, মাকরূহ ও গুনাহে কবীরা। সবগুলো থেকেই বেঁচে থাকা আবশ্যক। তবেই ঈমান গ্রহণীয় ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে।

শিরক কাজসমূহ

নিম্নলিখিত কাজগুলো শিরক। এসব হতে দূরে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য–
১. কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এ রকম আকীদা রাখা যে, তিনি সবসময় আমাদের সব অবস্থা জানেন। **২.** জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুরদের নিকট অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞেস করা। **৩.** কোন পীর–বুযুর্গকে দূরদেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি তা শুনতে পেয়েছেন। **৪.** কোন পীর–বুযুর্গ, জিন–পরী বা ভূত–ব্রাহ্মণকে লাভ–লোকসানের মালিক মনে করা। **৫.** কোন পীর বুযুর্গের কবরের নিকট আওলাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করা। **৬.** পীর বা কবরকে সিজদা করা। **৭.** কোন পীর–বুযুর্গের নামে শিরনি, সদকা বা মান্নত মানা। **৮.** কোন পীর–বুযুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা। **৯.** আল্লাহর হুকুম ছেড়ে অন্য কারো আদেশ বা সামাজিক প্রথা পালন করা। **১০.** কারো সামনে মাথা নিচু করে সালাম করা বা হাত বেঁধে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকা। **১১.** মহররমের সময় তাজিয়া বানানো। **১২.** কোন পীর–বুযুর্গের নামে জানোয়ার যবেহ করা বা কারো দোহাই দেওয়া। **১৩.** পীরের বাড়ির বা কোন বুযুর্গের দরগাহ বা তীর্থকে, কাঁবা শরীফের মতো আদব বা তা'যিম করা। **১৪.** কোন পীর–বুযুর্গ বা অন্য কারো নামে ছেলের নাক, কান ছিদ্র করা, আংটি পরান, চুল রাখা, টিকি রাখা ইত্যাদি। **১৫.** আলী বখশ, হোসাইন বখশ ইত্যাদি নাম রাখা। **১৬.** কোন জিনিসের বা ব্যারাম–পীড়ার ছুত লাগে বলে বিশ্বাস করা। **১৭.** মহররম মাসে পান না খাওয়া, নিরামিষ খাওয়া, খিচুড়ি খাওয়া ইত্যাদি। **১৮.** নক্ষত্রের তাছির মানা বা তিথি পালন করা। **১৯.** ভালো–মন্দ বার বা তারিখ জিজ্ঞেস করা। যেমন, অনেকে জিজ্ঞেস করে, এই চাঁদে বিবাহ শুভ কি–না? কোন দিন নতুন ঘরে যেতে হয়? রোববারে বাঁশ কাটা যায় কি–না? ইত্যাদি। **২০.** গণকের নিকট বা যার ঘাড়ে জিন সওয়ার হয়েছে, তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট জিজ্ঞেস করা। **২১.** কোন জিনিস হতে কু–লক্ষণ ধরা বা কুযাত্রা মনে করা। যেমন, যাত্রামুখে কেউ হাঁচি দিলে অনেকে সেটাকে কু–যাত্রা মনে করে থাকে। **২২.** কোন দিকে যাত্রা করার সময় ঘরের দুয়ারে মা থাকি বলে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করা। **২৩.** কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা। **২৪.** কোন বুযুর্গের নাম অযিফার মতো জপ করা। **২৫.** এ রকম বলা যে, আল্লাহ ও রাসূলের মর্জি থাকলে এ কাজ হবে, বা আল্লাহ–রাসূল যদি চান,

তবে এ কাজ হবে। **২৬.** এ রকম, বলা যে, উপরে খোদা, নিচে আপনি। **২৭.** কারো নামের কসম খাওয়া বা যিকির করা। কাউকে ‘পরম পূজনীয়’ সম্বোধন করে লেখা, ‘কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না’ বলা, ‘জয়কালী নেগাহবান’ ইত্যাদি বলা। **২৮.** তেমাথা পথে ভেট দেওয়া, পূজা উপলক্ষে কর্ম বন্ধ রাখা, দোল-পূজায় আবির মাখানো, বিষকরম পূজায় ছাতু খাওয়া, পৌষ মাস সংক্রান্তিতে গরু দৌড়ানো, ঘোড়া দৌড়ানো, আশ্বিন মাস সংক্রান্তিতে গাশ্চি, গোফাগুণে পূজা উপলক্ষে আমোদ উৎসব, নতুন কাপড় ক্রয়, পার্বণী দেয়া, মনসা পূজা বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নৌকা দৌড়ানো। হিন্দুদের আড়ঙ্গে, মিছিলে, উৎসবে যাওয়া। **২৯.** ছবি, ফটো বা মূর্তি রাখা, বিশেষ করে কোন বুযুর্গের ফটো তা’যিমের জন্য রাখা।

বিদ’আতের বর্ণনা

নিম্নলিখিত কাজগুলো বিদ‘আত। এগুলো থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

১. কোন বুযুর্গের মাযারে ধুমধামের সাথে উরস করা, মেলা বসানো, বাতি জ্বালানো। **২.** মেয়েলোকের বিভিন্ন দরগায় যাওয়া। **৩.** কবরের ওপর চাদর, আগরবাতি, মোমবাতি ও ফুল দেওয়া। **৪.** কবর পাকা করা। **৫.** কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্যে শরী‘আতের সীমারেখার বেশি তাযিম করা। **৬.** কবরে চুমো খাওয়া। **৭.** কবরে সিজদা করা। **৮.** দ্বীনের বা দুনিয়ার কাজের ক্ষতি করে দরগায়-দরগায় বেড়ানো। **৯.** কোন কোন অজ্ঞ লেখক আজমীর শরীফ, বাজেবোস্তান, পীরানে কার্লিয়ার ইত্যাদিকে মুসলমানদের তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করেছে, তা দেখে তীর্থ গমনের ন্যায় সেসব স্থানে যাওয়া। **১০.** উঁচু উঁচু কবর বানানো। **১১.** কবর সাজানো, সেখানে ফুলের মালা দেওয়া। **১২.** কবরে গম্বুজ বানানো। **১৩.** কবরে পাথর খোদাই করে কিছু লিখে লাগানো। **১৪.** কবরে চাদর, শামিয়ানা ইত্যাদি টানানো। **১৫.** মাযারে মিঠাই নজরানা দেওয়া।

জাহিলিয়্যাতের রসমের বর্ণনা

নিম্নলিখিত কাজগুলো জাহিলী বদরসম। এ থেকে দূরে থাকা কর্তব্যঃ

১. ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন ও ইলমে দ্বীন শিক্ষা না দিয়ে মূর্খ বানিয়ে রাখা বা কু-শিক্ষায়, কু-সংসর্গে লিপ্ত হতে সহায়তা করা। **২.** বিধবা বিবাহকে

দূষনীয় মনে করা। **৩.** বিবাহের সময় সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত দেশাচার-রসম পালন করা। **৪.** বিবাহে নাচ-গান করানো। **৫.** হিন্দুদের উৎসবে যোগদান করা। **৬.** আসসালামু আলাইকুম না বলে আদাব নমষ্কার বলা। **৭.** মুরুব্বিকে আসসালামু আলাইকুম বললে বেআদবি মনে করা। **৮.** মেয়েলোকদের দেবর, ভাসুর, মামাত, ফুফাত, খালাত, চাচাত ভাইদের বা ভগ্নিপতি, বেয়্‌ই, নন্দাই ইত্যাদির সঙ্গে হাসি-মশকরা করা বা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কিংবা পথে-ঘাটে বেড়ানো। **৯.** গান-বাদ্য শোনা। **১০.** জারি যাত্রা, সংকীর্তণ, গাজীর গীত, থিয়েটার, বায়স্কোপ, রেসকোর্স ইত্যাদিতে যোগদান করা। **১১.** সারঙ্গ, বেহালা, হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন ইত্যাদি বাজানো বা শোনা। **১২.** গান-গীত গাওয়া, বিশেষত খাজাবাবার উরসের নামে গান করা বা শোনাকে সওয়াবের কাজ মনে করা। **১৩.** নসব বা বংশের গৌরব করা। **১৪.** কোন বুযুর্গের বংশধর বা মুরীদ হলে, তিনিই পার করে দিবেন-এরূপ মনে করে নিজের আমল-আখলাক দুরুস্ত না করে বসে থাকা। **১৫.** কারো জাত-বংশ বা নসবে কোন দোষ-ক্রটি থাকলে তা খুঁজে বের করা এবং তা নিয়ে খোটা দেওয়া, গীবত করা। **১৬.** ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা। **১৭.** কোন হালাল পেশাকে অপমানের বিষয় মনে করা। যেমন, দপ্তরির কাজ করা, মাঝিগিরি বা দর্জিগিরি করা, মাছ বিক্রি করা, তেল বা নুনের দোকান করা, মজুরি করে পয়সা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা ইত্যাদি পেশাকে খারাপ মনে করা। **১৮.** আসসালামু আলাইকুম বলাকে বেআদবি মনে করা বা বললে উত্তর দিতে লজ্জাবোধ করা। **১৯.** চিঠিতে কাউকে পরমেশ্বর, পরম পূজনীয় লেখা। **২০.** নামের আগে 'শ্রী' লেখা বা আল্লাহর নাম না লিখে চিঠির উপরিভাগে 'হাবীব সহায়' লেখা। **২১.** সাক্ষাতে কারো তারিফ করা বা শরী'আতের সীমালঙ্ঘন করে বড়লোকের প্রশংসা করা। **২২.** বিবাহ-শাদীতে অযথা অপচয় ও অপব্যয় করা এবং হিন্দুদের রসম পালন করা; যেমন, ফুল, কুলা দ্বারা বৌ বরণ করে নেওয়া। **২৩.** ঢাকুন পাড়িয়ে যাওয়া। **২৪.** ভরা মজলিসে বৌ-এর মুখ দেখানো। **২৫.** গীত গেয়ে স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়ে বর-কনেকে গোসল দেয়া। **২৬.** পণ দাবি করা; [হ্যাঁ, মেয়ের বিবাহে বংশ অনুসারে মহর ধার্য করে তা শর্ত অনুযায়ী উসূল করা জায়িয, কিন্তু তা মেয়ের পাওনা, বাপ-ভাইয়ের নয়।] **২৭.** বিবাহের সময় জোর-জবরদস্তি করে দাওয়াত গ্রহণ করা, বা দাওয়াত না দিলে অসুন্তুষ্টি প্রকাশ করা। **২৮.** মাতুলের টাকা বা খাতিরে টাকা লওয়া। **২৯.** নওশাকে [দুলহাকে] শরী'আতের খেলাফ লেবাস-পোশাক পরানো। **৩০.** পুরুষদের জন্যে সোনার আংটি পরা বা পরানো। **৩১.** পুরুষদের জন্যে হাতে

পায়ে বা নখে মেহেদি লাগানো। [কিন্তু মেয়েলোকের জন্যে মেহেদি লাগানো মুস্তাহাব।] **৩২.** আতশবাজী করা। **৩৩.** বিবাহে কাগজ কেটে বা কলাগাছ গেড়ে মাহফিল সাজানো। **৩৪.** মাহরাম-গায়রে মাহরাম ভেদাভেদ না করে মেয়েলোকদের মধ্যে জামাই বা অন্য লোক যাওয়া এবং মেয়েলোকদের গীত গাওয়া। **৩৫.** কেউ মরে গেলে চিৎকার করে, মুখ বুক পিটিয়ে বা মৃত ব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা করে ক্রন্দন করা। **৩৬.** মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়কে দূষণীয় বা খারাপ মনে করা। **৩৭.** বেশি সাজসজ্জা, ফ্যাশন বা বাবুগিরিতে লিপ্ত হওয়া। **৩৮.** সাদাসিধা বেশ-ভূষাকে ঘৃণা করা, লম্বা ঢিলা পিরহান, টাখনুর উপরে পায়জামা পরা ও টুপি পরাকে অবজ্ঞা করা, বিশেষত: এসব দেখে উপহাস করা। **৩৯.** তসবির ও ছবি লটকিয়ে ঘরের বা কামরার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। **৪০.** পুরুষের রেশমী লেবাস পরা, সোনার আংটি, সোনার চেইন, সোনার ঘড়ি বা সোনার ফ্রেমের চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করা। **৪১.** পাতলা কাপড়, ধুতি, হাফপ্যান্ট বা প্যান্ট বা হ্যাট কোট পরা। **৪২.** মেয়েদের বাজনাওয়ালা যেওর ব্যবহার করা। **৪৩.** কাফিরদের অর্থাৎ হিন্দু বা ইংরেজদের বেশ-ভূষা, ফ্যাশন অবলম্বন করা। **৪৪.** হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে বা কোন পীরের দরগায় যে মেলা বসে, তাতে যোগদান করা। **৪৫.** বেটা ছেলেদের যেওর পরানো। **৪৬.** দাড়ি এক মুঠি থেকে কামানো, ছাটানো বা উপড়ানো। **৪৭.** মোচ বাড়ানো, এলফেট রাখা। **৪৮.** টাখনুর নিচ পর্যন্ত পায়জামা বা লুঙ্গি পরা। **৪৯.** পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোকের বা স্ত্রী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণা করা। **৫০.** শুধু সৌন্দর্যের জন্যে বা ফ্যাশনের জন্যে কামরার ছাদে বা দেয়ালে চাঁদোয়া লটকিয়ে রাখা। **৫১.** কালো খেযাব লাগানো। **৫২.** কোন জীবকে বা জিনিসকে অশুভ মনে করা। যেমন, পেঁচা ঘরে ঢুকলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে, বাটখারায় পা লাগলে কারবারে বরকত থাকবে না, তিল হাড়ি মাটিতে স্পর্শ করলে তিলে বিছা লাগবে, ধান বুনে খৈ ভাজলে ধান জ্বলে যাবে, জাল ডিঙ্গালে জালে মাছ পড়বে না ইত্যাদি অলীক ধারণা পোষণ করা। **৫৩.** হিন্দু শাস্ত্র মতে একটি রাত এমন শর্ত অনুযায়ী উসূল করা জায়িয রয়েছে, যাতে চুরি করলে পাপ নেই। সেই রাতে মুসলমানদের সেরূপ করা। **৫৪.** শরীরে সূঁচের দ্বারা খোদাই করে ব্যাঘ্র বা নিজ মূর্তি কিংবা অন্য কোন ছবি অঙ্কন করা। **৫৫.** পাকা চুল বা দাড়ি উপড়িয়ে ফেলা। **৫৬.** শাহওয়াতের সাথে কারো সঙ্গে কোলাকুলি-গলাগলি করা বা হাত মিলানো। **৫৭.** শতরঞ্জ, তাস, পাশা, কড়ি ইত্যাদি খেলায় লিপ্ত হওয়া। **৫৮.** টিভি, সিনেমা, বায়স্কোপ ও থিয়েটার দেখা। **৫৯.** যাত্রা, জারি, মারফতি ইত্যাদি গান শোনা। **৬০.** সার্কাস দেখা। **৬১.** খরিদদারের সঙ্গে ধোঁকাবাজী করা বা

মাল দেখে, সে মাল ক্রয় না করলে তাকে মন্দ বলা। **৬২.** শরী‘আতের খেলাফ ঝাড়-ফুঁক বা তাবিয-তুমার করা। **৬৩.** অনুমান করে শরী‘আতের মাসআলা বাতানো। **৬৪.** হিন্দুদের নিকট থেকে তাবিয বা পানি-সূতা পড়িয়ে নেওয়া। **৬৫.** দোকান শুরু করতে, নৌকা খুলতে বা জাল ফেলতে নেবা দেওয়া বা নৌকার গলুয়ে পানির ছিটা দেওয়া ইত্যাদি।

মূর্খতাবশত সমাজে এরূপ আরো অনেক কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে সেসবও পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

কবীরা গুনাহের বর্ণনা

কবীরা গুনাহ করলে ঈমান অত্যন্ত কমজোর হয়ে পড়ে এবং অনেক দিনের ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা অর্জিত নূর নষ্ট হয়ে যায়। আর এর ভয়াবহতা এমন যে, একটি গুনাহে কবীরাই মানুষকে জাহান্নামে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তাওবা ছাড়া গুনাহে কবীরা মাফ হয় না। কবীরা গুনাহকে জায়িয বা হালাল মনে করলে ঈমান চলে যায়।

এখানে কতগুলো কবীরা গুনাহের তালিকা দেওয়া হলো। প্রত্যেকেরই এসব গুনাহ হতে বেঁচে নিজ নিজ ঈমানের হেফাযত করা অবশ্য কর্তব্য।

১. শিরক করা। **২.** মা-বাপকে কষ্ট দেয়া। **৩.** যিনা করা। **৪.** এতিমের মাল খাওয়া। **৫.** জুয়া খেলা। **৬.** বিনা প্রমাণে কারো ওপর তুহমত লাগানো। **৭.** জিহাদ হতে অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যে ধর্মযুদ্ধ হয়, তা থেকে পলায়ন করা। **৮.** মদ [শরাব] পান করা। **৯.** কোন লোকের ওপর অত্যাচার করা। **১০.** গীবত করা অর্থাৎ অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করা। **১১.** কারো প্রতি বদগোমানী করা, অর্থাৎ অনর্থক কাউকে মন্দ মনে করা। **১২.** নিজেকে ভালো মনে করা। **১৩.** অন্তরে আল্লাহর ভয় না রাখা বা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া। **১৪.** ওয়াদা করে তা পূরণ না করা। **১৫.** পাড়া-প্রতিবেশীর ঝি-বৌকে কু-নজরে দেখা। **১৬.** আমানতের খেয়ানত করা। **১৭.** ফরয কাজ না করা, যেমন নামায না পড়া, রমযানের রোযা না রাখা, যাকাত না দেওয়া, হজ্ব না করা ইত্যাদি। **১৮.** কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। **১৯.** সত্য সাক্ষ্য গোপন করা। **২০.** মিথ্যা কথা বলা। **২১.** মিথ্যা কসম খাওয়া। **২২.** কারো জানের, মালের বা ইজ্জতের হানি করা। **২৩.** আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা। **২৪.** জুমু‘আর নামায না পড়া। **২৫.** ওয়াক্তিয়া নামায না পড়া। **২৬.** কোন মুসলমানকে কাফির বলা। **২৭.** কারো গীবত করা বা শোনা। **২৮.** চুরি করা। **২৯.** জালিম-অত্যাচারীদের তোশামোদ করা। **৩০.** সুদ বা ঘুষ খাওয়া।

৩১. অন্যায় বিচার করা। **৩২.** কোন জিনিস মেপে দিতে কম দেওয়া এবং নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া। **৩৩.** দাম ঠিক করে পরে জোর-জবরদস্তি করে কম দেওয়া। **৩৪.** বালকদের সাথে কু-কর্ম করা। **৩৫.** হায়িয ও নিফাস অবস্থায় বা মলদ্বারে স্ত্রী সহবাস করা। **৩৬.** ধান-চাউলের অধিক দর দেখে খুশি হওয়া। **৩৭.** বেগানা স্ত্রীলোককে দেখা বা তার সাথে কথাবার্তা বলা বা তার নিকটে একা একা বসা। তেমনিভাবে মহিলাদের জন্যে বেগানা পুরুষকে দেখা বা তার সঙ্গে বেপর্দা কথা বলা বা দেখা দেওয়া। **৩৮.** গরু-বাছুরের সাথে কু-কর্ম করা। **৩৯.** কাফিরদের রীতি-নীতি পছন্দ করা। **৪০.** গণকের কথা ঠিক মনে করা। **৪১.** নিজেকে বড় মুসল্লি ও বড় পরহেযগার বলে দাবি করা। **৪২.** প্রিয়জনের বিয়োগে সিনা পিটিয়ে চিৎকার করে ক্রন্দন করা। **৪৩.** খাওয়ার জিনিসকে মন্দ বলা। **৪৪.** নাচ দেখা। **৪৫.** লোক দেখানোর জন্যে ইবাদত করা। **৪৬.** গান-বাদ্য শোনা। **৪৭.** অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা। **৪৮.** অবৈধ কাজ করতে দেখে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নসিহত না করা। **৪৯.** হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা। **৫০.** কারো দোষ অন্বেষণ করা। **৫১.** জমিনের আইল বা লাইন ভেঙে সীমানা পরিবর্তন করা। **৫২.** মানুষ খুন করা। **৫৩.** কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা। **৫৪.** ভিডিও, টিভি ভিসিআর ক্রয় এবং তা ঘরে রাখা ও দেখা। **৫৫.** সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা করা বা সিনেমা দেখা। **৫৬.** নাট্য ও নৃত্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা বা দেখা। **৫৭.** সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা। **৫৮.** পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করা বা তার সহযোগিতা করা। **৫৯.** প্রমোদবালার পেশা গ্রহণ করা। **৬০.** খাজাবাবা বা জারিগানের আসর বসানো বা তাতে অংশগ্রহণ করা। **৬১.** সাবালকদের হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা করা বা খেলাধুলা করা। **৬২.** গান ও নৃত্য শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া। **৬৩.** বীমা, ইন্স্যুরেন্সে অংশগ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত সকল প্রকার বীমা ও ইন্স্যুরেন্স সুদ ও জুয়ার মধ্যে শামিল। **৬৪.** দাবা খেলা। **৬৫.** শরী'আত বর্জিত শেয়ার ব্যবসা করা। **৬৬.** লটারির টিকেট ক্রয়-বিক্রয় ও তার পুরস্কার গ্রহণ করা। **৬৭.** মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরি করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা। **৬৮.** স্মৃতি হেসেবে অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখা, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো বা বিজাতীয় প্রথা পালন করা। **৬৯.** জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা, ভবিষ্যতের খবর বলা বা তাদের কাছে এসব জিজ্ঞাসা করা। **৭০.** মন্দিরে, ওরসে বা কোন শিরক-বিদ'আতের কাজে আর্থিক সাহায্য করা। **৭১.** নাইট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা। **৭২.** যুবক-যুবতীদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা বা সেখানে বেপর্দা হয়ে পড়াশোনা করা। **৭৩.** মডেলিং করা।

কতিপয় কবীরা গুনাহের বিস্তারিত বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

তোমারা যদি নিষিদ্ধ বড় বড় পাপগুলো হতে বিরত থাক, তবে তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলোকে আমি মাফ করে দেব। [সূত্র: সূরা নিসা, আয়াত ৩১]

এ আয়াতের আলোকে এখানে কতিপয় গুনাহে কবীরার সবিস্তারে আলোচনার আশা করছি, যাতে সেসব বিস্তারিতভাবে জেনে সেই সকল পাপকাজ হতে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়।

১. শিরক : এটা সর্বাপেক্ষা মহাপাপ। এর বিপরীত তাওহীদ। দুনিয়ার জীবনেই তাওবা করে তাওহীদ গ্রহণ না করে এই পাপের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে শিরক পাপের শাস্তি স্থায়ী জাহান্নাম হতে বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই।

২. হুকূকুল ওয়ালিদাইন : অর্থাৎ মা-বাবার নাফরমানি করে মা-বাবার মনে কষ্ট দেওয়া। এটা অন্যতম কবীরা গুনাহ। এর বিপরীত বিররুল ওয়ালিদাইন। অর্থাৎ মা-বাবার খিদমত করা অনেক বড় নেকী।

৩. ক্বাত'ই রেহেম : অর্থাৎ এক মায়ের পেটের ভাই-বোনদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা। মায়ের পেটের বলতে দাদীর পেটের চাচা, ফুফু, নানীর পেটের মামা, খালা এবং ভাই-বোনদের ছেলেমেয়ে, ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগ্নে ভাগ্নী, সবাইকেই বোঝায়। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন। যে যত বেশি নিকটবর্তী, তার হক তত বেশি। ক্বাত'ই রেহেমী করা কবীরা গুনাহ। এর বিপরীত সিলাহ রেহমী বা আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।

৪. যিনা : অর্থাৎ নারীর সতীত্ব নষ্ট করা, পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা, ব্যভিচার করা, এটা অত্যন্ত জঘন্য কবীরা গুনাহ। এর বিপরীত নারীর সতীত্ব রক্ষা করা ও পুরুষের চরিত্রকে পবিত্র রাখা ফরয। নারীর সতীত্ব ও পুরুষের চরিত্র পবিত্র রাখার জন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের মধ্যে পর্দা বিধান করেছেন এবং বেপর্দার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। নারী জাতির জন্য পর্দা অবলম্বন ফরয এবং উত্তেজনা বর্ধনকারী, যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী যাবতীয় জিনিস যেমন অশ্লীল ছবি, নাটক, থিয়েটার, সিনেমা,

বায়োস্কোপ, টিভি, ভিসিআর ইত্যাদি দেখা হারাম। তদ্রূপ বালকদের সঙ্গে কু-কর্ম করা যিনার চেয়েও বড় পাপ এবং এর শাস্তিও ভয়ানক। বিবাহিত অবস্থায় যিনা করলে এবং তা স্বীকার করলে অথবা চারজন সত্যবাদী সাক্ষীর দ্বারা তা প্রমাণিত হলে ইসলামী হুকুমতে তার শাস্তি রজম অর্থাৎ পাথর মেরে প্রাণে বধ করে ফেলা। আর অবিবাহিত অবস্থায় যিনা প্রমাণিত হলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। আর বালকদের সাথে কুকর্মকারীর শাস্তি হচ্ছে তাকে আগুণ দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া।

হযরত ঈসা (আ) একদিন ভ্রমণকালে দেখতে পেলেন-একটি কবরের মধ্যে একজন মানুষকে আগুণ দ্বারা জ্বালানো হচ্ছে। তিনি আল্লাহর নিকট এর ভেদ জানতে চাইলে আল্লাহর নির্দেশে সেই লোকটি বললো, এই আগুণ সেই বালকটি, যাকে আমি ভালোবাসতাম। তারপর ক্রমান্বয়ে আমি বালকটির সঙ্গে কুকর্ম করে বসলাম। সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে এরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৫. চুরি করা কবীরা গুনাহ। সাধারণ চুরির চেয়ে বিশ্বাসের বিশ্বাসঘাতকতা করে চুরি করা অর্থাৎ আমানতের খিয়ানত করা অনেক বেশি পাপ।

৬. অন্যায়ভাবে যে কোন মানুষ খুন করা কবীরা গুনাহ। ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারকারী সংখ্যালঘুকে খুন করা, তার মাল চুরি করা ও তার নারীর সতীত্ব হরণ করা এক সমান পাপ এবং এক সমান শাস্তি।

তিন কারণ ব্যতীত কোন মানুষের জীবনকে বধ করা যায় না। যথা-

ক. মানুষ খুন করলে।

খ. বিবাহিত অবস্থায় অন্য নারীর সতীত্ব হরণ করলে।

গ. মুরতাদ হয়ে গেলে অর্থাৎ মুলসমান হয়ে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে। অবশ্য এ শাস্তি জারি করার অধিকার একমাত্র ইসলামী হুকুমতের প্রশাসকদের।

৭. মিথ্যা তুহমত লাগানো। এটাও কবীরা গুনাহ। সবচেয়ে বড় তুহমত হচ্ছে যিনার তুহমত। কারো ওপর যিনার তুহমত দিলে আখিরাতে তার দোযখের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়ার শাস্তি এই যে, তাকে আশিটি দুররা মারতে হবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তুহমত ও অশ্লীল গালির শাস্তি বিচারক ও সমাজনেতার বিচার অনুসারে কমবেশি হবে। শাস্তির দ্বারা সমাজ পবিত্র হয়।

৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। এটা অত্যন্ত মারুত্মক কবীরা গুনাহ। এরও শাস্তি বিধান করা রাষ্ট্রের ও সমাজের কর্তব্য। মিথ্যা বলা মহাপাপ। এই পাপের প্রতি সমাজের ঘৃণা থাকা দরকার। শৈশবে শিশুরা যাতে মিথ্যায় অভ্যস্ত না হয়, সেদিকে অভিভাবকদের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।

৯. যাদু করে কারো ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা কবীরা গুনাহ। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক শয়তান-জিনের সাধনা করে মাছ, গোশত পরিত্যাগ করে পাক-ছাফ ও ফরয গোসল পরিত্যাগ করে, কালীর সাধনা করে, যাদুবিদ্যা হাসিল করে, মূর্খ সমাজে পীর বা ফকির নামে পরিচিত হয়ে গোপনে গোপনে কারো মাথার চুল কেটে নিয়ে, কারো কাপড়ের কোনা কেটে, কারো ঘরের দুয়ারে শ্মশানের কয়লা, শ্মশানের হাড়ের তাবিজ পুঁতে, কাউকে বান মেরে মানুষের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে, একেই যাদু বলে। শরী'আত অনুসারে এটা অত্যন্ত জঘন্য পাপকাজ। এরূপ ব্যক্তিকে ধরতে পারলে তার শাস্তি বিধান করা সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। আখিরাতের শাস্তি তো পরে হবে, দুনিয়ার শাস্তি এখানেই হওয়া দরকার। বিনা সাক্ষীতে বিনা প্রমাণে কারো ওপর কোনোরূপ [চুরি ইত্যাদির] দোষারূপ করা এই ভিত্তিতে যে, সূরা ইয়াসীন পড়ে লোটা ঘুরানোতে বা বাটি চালানো, খুর চালান দেওয়াতে অমুকের নাম উঠেছে, এটাও এক প্রকার যাদুর অন্তর্গত। ইসলাম এরূপ নীতিহীন-ভিত্তিহীন দোষারোপকে কিছুতেই অনুমোদন করে না।

১০. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা খেলাফ করা, কথা দিয়ে বিনা উজরে তা ঠিক না রাখা, এগুলোও মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

১১. আমানতের খিয়ানত করা কবীরা গুনাহ। আমানত অনেক রকমের আছে। টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তির আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি।

১২. গীবত করা তথা কারো অসাক্ষাতে তার বদনাম ও নিন্দা করা। [যদিও তা সত্য হয়] কবীরা গুনাহ।

১৩. বিদ্রোহী বানানো অর্থাৎ স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মনিবের বিরুদ্ধে চাকরকে, উস্তাদের বিরুদ্ধে শাগরিদকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে ক্ষেপিয়ে তোলাও কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে আছে, 'কোন চাকরকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে অথবা স্ত্রীকে তার স্বমীর বিরুদ্ধে যে উস্কানী দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

১৪. নেশাযুক্ত জিনিস পান করা কবীরা গুনাহ। যেমন মদ, গাঁজা হিরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। নেশার দ্বারা উদ্দেশ্য, যা পান করলে ব্রেনের স্বাভাবিক কর্ম ব্যাহত হয়।

১৫. যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা। মদের দ্বারা যেমন নেশা হয়, মদ্যপানে যেমন, মানুষ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যায়, তার চেয়েও মানুষের মধ্যে বড় নেশা হলো যৌন উত্তেজনার নেশা এবং যৌন উত্তেজনা হলে মানুষ

বুদ্ধি হারিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। পুরুষ জাতির এই যৌনক্ষুধাকে যারা উত্তেজিত করে অর্থাৎ নারী জাতি যখন যুবক পুরুষদের সামনে তাদের রূপ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়ায়, মেকি রূপ, অঙ্গভঙ্গি করে বা নেচে নেচে দেখায় বা নগ্নমূর্তি, উলঙ্গ ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, [যেমন টিভি, ভিসিআর ও সিনেমায় অশ্লীল ছবি দেখানো হয়], তখন যুবকদের যৌনক্ষুধা উত্তেজিত হয়ে তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পশুর ন্যায় আচরণ করে বসে এবং তাদের স্বাস্হ্য, সম্পত্তি, সময় ও স্বচ্ছ মনের এবং সুস্থ বিবেকের ভীষণ ক্ষতি হয়। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তোমরা যিনার ধারে-কাছেও যেও না"। [সূত্র: সূরাহ বনী ইসারাঈল, আয়াত ৩২] অর্থাৎ যে কাজে যিনার উপক্রম হতে পারে বা যৌন চাহিদার সৃষ্টি হতে পারে, সে কাজ করো না। এই ক্ষতি যাদের দ্বারা হয়, তারাও মহাপাপী।

১৬. জুয়া খেলা ও লটারি ধরা এটাও কবীরা গুনাহ। এর নেশাও মদের নেশা ও কামিনী-কাঞ্চনের নেশা অপেক্ষা কম নয়। জুয়া খেলা অনেক রকমের আছে। ঘোড় দৌড়, কুকুর দৌড়, পাশা খেলা, তাস খেলা, সতরঞ্জ খেলা বা টিকেট ধরা-এ সবই জুয়া। অর্থাৎ যাতে বাজি ধরা আছে, তা-ই জুয়া। জুয়া খেলা মহাপাপ। সমাজে ও রাষ্ট্রে এর প্রসার বন্ধ করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার।

১৭. সুদ খাওয়া কবীরা গুনাহ। সুদ অনেক প্রকারের আছে। যেমন, সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, ব্যাংকের সুদ, বীমা-ইন্স্যুরেন্সের সুদ ইত্যাদি। সর্ব প্রকারের সুদই মহাপাপ। প্রচলিত সকল বীমা ইন্স্যুরেন্স সুদ বা জুয়ার মধ্যে শামিল। আর স্বাভাবিকভাবে যে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়, তাও সুদের মধ্যে শামিল। সুতরাং, বীমা ও ইন্স্যুরেন্স থেকে পরহেজ করা ফরয। সরকারী আইনের কারণে কেউ অপারগ হলে সে অবস্থার হুকুম কোন মুফতীর নিকট থেকে জেনে নিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহর অটল বিধান, সুদের দ্বারা আসে ধ্বংস, আর যাকাত, খয়রাত ও দানের দ্বারা আসে বরকত"।

يَمحَقُ اللَّهُ الرِّبوٰا وَيُربِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ أَثيمٍ (٢٧٦)

[সূত্র: সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৭৬]

সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে। কাজেই এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, সুদ না হলে ব্যাংক কীভাবে চলবে? আর ব্যাংক না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যেই বা চলবে কীভাবে? সুদ খাওয়া আর দেওয়া উভয়ই কবীরা গুনাহ। তবে সুদ খাওয়া সর্বাবস্থায়ই মহাপাপ। কিন্তু জানমালের হেফাযতের জন্য অপারগ হয়ে সুদ দেওয়া মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৮. রিশওয়াত। অর্থাৎ ঘুষ খাওয়া কবীরা গুনাহ। ঘুষের মাধ্যমে অবৈধভাবে কার্য উদ্ধার করা মহাপাপ। যাদের সরকারী বেতন ধার্য করা আছে, তারা কর্তব্য কাজে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করবে, সবই ঘুষ বলে বিবেচিত হবে। চাই একটি সিগারেট হোক বা এক কাপ চা কিংবা এক খিলি পান অথবা একটি ডাবই হোক এবং যদিও দাতা তা খুশি হয়ে দেয়। আর যাদের কোন বেতন ধার্য করা নেই, তারা যদি চুক্তির মাধ্যমে মজুরী নির্ধারণ করে কোন কাজ করে এবং মজুরী গ্রহণ করে, তবে তা ঘুষ নয়। যারা সরকারের বেতনভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়, তাদের কোন মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মান অথবা ভালোবাসার নিদর্শনস্বরুপ যদি তাদের জন্য কোন উপঢৌকন দেওয়া হয়, তবে সেটা ঘুষ নয়। বরং এরুপ উপঢৌকনকে বলা হয় হাদিয়া। কিন্তু এরুপ দানের মধ্যে দাতার পক্ষে কোনরুপ কার্যোদ্ধারের নিয়ত বা গ্রহীতার পক্ষে কোনরুপ আশা থাকলে তা আর হাদিয়া থাকবে না। বরং সেটাও এক প্রকার রিশওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। শুধু সুপারিশ করে বিনিময় গহণ করা, সত্য সাক্ষ্যদানের বিনিময় গ্রহণ করা, ন্যায় বিচারের বিনিময় গ্রহণ করা, মৌখিকভাবে মাসআলা বলে, কুরআন পাঠ করে সাওয়াব রেসানীর বিনিময় গ্রহণ করা, তারাবীহ নামাযে কুরআন শুনিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা, মুরীদ করে, দ্বীনের সবক বলে দিয়ে, নসিহত করে বিনিময় গ্রহণ করা-এসবও রিশওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ন্যায় বিচার করার জন্য, দ্বীনি সবক শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং নসিহত দ্বারা চরিত্র গঠন করার জন্য কিছু ভাতা নির্ধারণ করে দিলে, তা হারাম বা রিশওয়াত হবে না।

১৯. জোর-জুলুম করে অর্থ বা অতর্কিতভাবে কোন মুসলমান বা কোন সংখ্যালঘুর ছোট কিংবা বড় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হরণ করা বা ভোগ দখল করা কবীরা গুনাহ।

২০. অনাথ এতিমের মাল বা নিরাশ্রয় বিধবার মাল খাওয়া কবীরা গুনাহ। এতিমও বিধবার মাল খাওয়া যেমন মহাপাপ, তদ্রূপ একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে বিধবার খেদমত করা মহাপুণ্যের কাজ।

২১. আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী তথা হজ্জ যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা কবীরা গুনাহ।

২২. মিথ্যা কসম খাওয়া কবীরা গুনাহ।

২৩. কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া, মুসলমানে মুসলমানে গালাগালি করা কবীরা গুনাহ। কারণ মিথ্যা তুহমাত ও অশ্লীল কথাবার্তা প্রয়োগ-এই দু'টি পাপের দ্বারা গালি তৈরি হয়। হাদীসে আছে,"কোন মুসলমানকে যে গালি দিবে, সে ফাসিক হয়ে যাবে।"

২৪. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ। জিহাদের আসল অর্থ–আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। এমনকি যদি দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে হয়, তাতেও কুন্ঠাবোধ না করা। দ্বীনের দুশমনরা সত্য ধর্মকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার জন্য অনেক দূর থেকে অনেক সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চেষ্টা–তদবির করে সেগুলো উদ্ধার করে। সেসবের প্রতিকার করা জিহাদের পর্যায়ভুক্ত। আর যে জামানায় বৈধ যে উপায়ে দ্বীন জারি করা যায় এবং দ্বীনের দুশমনদেরকে দুর্বল করা যায়, সে জামানায় সেই কাজই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সেরূপ দ্বীনের খিদমত হতেও পলায়ন করা জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করার শামিল ও সমতুল্য গুনাহর কাজ।

২৫. ধোঁকা দেওয়া বিশেষত শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা কর্তৃক জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া মারাত্মক কবীরা গুনাহ। কারবারের মধ্যে, বেচা–কেনার মধ্যে ধোঁকা দেয়াও মহাপাপ। কিন্তু শাসক বা বিচারক হয়ে ধোঁকা দেওয়ার তুলনা নেই।

২৬. অহংকার করা কবীরা গুনাহ। পদের অহমিকা বা ধন–সম্পদের গৌরবে গরিবদেরকে তুচ্ছ মনে করা বা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করায় অন্য কোন বংশীয় লোকদেরকে হেকারত বা তুচ্ছ জ্ঞান করা, যেমন যারা কাপড় বুনে, তাদেরকে জোলা বলে তুচ্ছ করা, যারা তেল উৎপাদন করে তাদেরকে তেলি বলে তুচ্ছ করা, যারা কৃষিকাজ করে, তাদেরকে চাষা বলে হেকারত করা, যারা আরবীতে ধর্মবিদ্যা চর্চা করে তাদেরকে মোল্লা বলে তুচ্ছ করা ইত্যাদি অহংকার–তাকাব্বুরও কবীরা গুনাহ বা মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত।

২৭. বাদ্য–বাজনাসহ নাচ–গান করা কবীরা গুনাহ। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘বর্বরতার যুগের কু–প্রথা ও কু–সংস্কারসমূহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যেমন–বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। [সূত্র : আলকামেল ফিজ্জুআফা খন্ড–৬, পৃষ্ঠা–৪১১৮]

২৮. ডাকাতি করা, লুন্ঠন করা কবীরা গুনাহ। প্রত্যেক মুসলমানের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রত্যেক অমুসলমান নাগরিকের জান–মাল ও ইজ্জত পবিত্র আমানত। এ আইন ভঙ্গ করে কারো জান–মাল বা ইজ্জত হরণ করা কবীরা গুনাহ।

২৯. স্বামীর নাফরমানি করা কবীরা গুনাহ। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তিন প্রকার লোকের ইবাদত–বন্দেগী যেমন–

নামায-রোযা ইত্যাদি কবুল হয় না। যথা- **ক.** ক্রীতদাস, যদি তার প্রভুর নিকট হতে পলায়ন করে, **খ.** স্ত্রী, যদি তার স্বামীকে নারাজ রাখে, **গ.** মদখোর, যে নেশা পান করে"। [সূত্র : ছহীহে ইবনে খুজাইমা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৯, হাদীস-৯৪০]

একজন মেয়েলোক স্বামীর হক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাকে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,"খবরদার, সাবধান থাক! সবসময় লক্ষ্য রেখ, স্বামীর মনের মধ্যে তুমি আছ কি না? জেনে রেখ, পতিই সতীর গতি। স্বামীই স্ত্রীর বেহেশত অথবা দোযখ।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রাযি) বর্ণনা করেন, "হে কন্যাসকল! তোমরা নারী জাতি। তোমরা যদি তোমাদের স্বামীর হক সম্পর্কে জানতে, তবে প্রত্যেক নারী তার স্বামীর পায়ের ধুলা-কাদা মুখের দ্বারা সাফ করতো।"

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলার আইনে যদি কারো জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা জায়িয হতো, তবে আমি প্রত্যেক স্ত্রীকে আদেশ করতাম, তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।" [সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২১৯ ও তাবারানী কাবীর খন্ড, হাদীস-৫১১৭]

স্বামীর হক স্ত্রীর ওপর এত বেশি। প্রত্যেক স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব-হায়া-শরম সহকারে স্বামীর সামনে চক্ষু নিচু করে রাখা এবং স্বামীর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করা এবং স্বামী যখন কথা বলেন, তখন চুপ করে থাকা। যখনই স্বামী বাড়ি আসেন, তখনই তার কাছে এসে তার প্রতি সম্মান করা এবং যে সমস্ত কাজে স্বামী অসন্তুষ্ট হন, সেই সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকা। আর যখন স্বামী বাইরে যান, তখন তার যাবতীয় নির্দেশ মুতাবিক কাজ সমাধা করা। স্বামী যখন শয়ন করেন, তখন নিজেকে তার সামনে পেশ করা এবং স্বামীর অনুপস্হিতিতে তার ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ, তার সন্তান-সন্ততি ও স্বীয় ইজ্জত-আব্রু হেফাযত করা, তাতে আদৌ কোনরূপ খিয়ানত না করা। সুগন্ধি ব্যবহার করে স্বামীর সামনে আসা এবং মুখ, শরীর, কাপড় যেন কোনরূপ দুর্গন্ধযুক্ত না হতে পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। স্বামীর উপস্হিতিতে সাজ-সজ্জা করা ও তার অনুপস্হিতিতে সাজ-সজ্জা না করা, স্বামীর ভাই-বোনদের ভালোবাসা, তাদেরকে আদর-যত্ন ও ইজ্জত সম্মান করা। স্বামী যা কিছু এনে দেয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা, শোকর করা। স্বামীর বাড়ির বাইরে না যাওয়া। যদি প্রয়োজনবশত কোথাও যেতে হয়, তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাওয়া এবং ময়লা কাপড় পরিধান করে ও ময়লাযুক্ত বোরকা পরিধান করে যাওয়া। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- "যে মেয়েলোক তার স্বামীর বাড়ি হতে স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাইরে যায়, তাঁর ওপর ফেরেশতাগণ লানত করতে থাকেন।"

ইসলাম ধর্মের ও মানব কল্যাণের অনেক শত্রু আছে। তারা বলে থাকে যে, পুরুষরা নারীদেরকে পরাধীন করে রেখেছে। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রান্ত। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই স্ত্রীকে স্বামীর তাবেদারি করে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

الرِّجالُ قَوّٰمونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلىٰ بَعضٍ وَبِما أَنفَقوا مِن أَموٰلِهِم ۚ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِلغَيبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالّٰتى تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِى المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ ۖ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا (٣٤)

“পুরুষরা নারীদের অভিভাবক।” [সূত্র : সূরাহ নিসা, আয়াত-৩৪]

ইসলাম যেমন নারীদেরকে স্বামীর পূর্ণ তাবেদারি করার হুকুম করেছে, তদ্রূপ স্বামীদেরকেও নির্দেশ দিয়েছে, নিজ স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। দুর্ব্যবহার বা জুলুম করতে অতি কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে এবং যথাসম্ভব তাদের ভুল-ত্রুটিকে মাফ করতে কঠোর তাগিদ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিয়েছেন, “তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।”

৩০. জায়গা-জমির সীমানা নষ্ট করা কবীরা গুনাহ। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জায়গা-জমির সীমানা যে নষ্ট করবে, তার ওপর লানত।”

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি জায়গা-জমির সীমানা নষ্ট করে অন্যের এক বিঘত জমি হরণ করবে, কিয়ামতের দিন তার স্কন্ধে এই পরিমাণ সাত তবক জমিন চাপিয়ে দেওয়া হবে।” [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২]

৩১. শ্রমিকের মজুরি কম দেওয়া কবীরা গুনাহ। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে লোক শ্রমিকের শ্রমের পূর্ণ মজুরি দেয় না বা পূর্ণ মজুরি দিতে টাল-বাহানা করে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াব।” হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রানুগত সংখ্যালঘুর ওপর জুলুমকারী সম্পর্কেও এরূপ উক্তি করেছেন।

৩২. মাপে কম দেওয়া কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- “যারা মাপে কম দিবে, তাদের জন্য ওয়ায়েল নামক দোযখ নির্ধারিত রয়েছে।”

৩৩. দ্রব্য সামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রিত করা কবীরা গুনাহ।

৩৪. খরিদ্দারকে ধোঁকা দেওয়া কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে আছে- “যে ধোঁকা দিবে, সে আমার উম্মত নয়।”

৩৫. স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে, শর্তের সাথে হিলা করে পুনরায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা কবীরা গুনাহ। একে তো তালাক কথাটাই এমন, যা

অত্যন্ত ঘৃণিত। কেবলমাত্র জরুরতের কারণেএটাকে জায়িয রাখা হয়েছে। নতুবা এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর নেই। তাই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– "যত রকমের জায়িয জিনিস আছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে তালাক।" [সূত্র : আবু দাউদ শরীফ খন্ড–১, পৃষ্ঠা–২৯৬] তারপর একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলা, এটা আরো খারাপ। আবার তিন তালাকের দ্বারা যে স্ত্রী হারামে মোগাল্লাযা হয়ে গেছে, তাকে শর্ত করে হিলার মাধ্যমে ঘরে রাখা খুবই জঘন্য ব্যাপার। এজন্যই হাদীস শরীফে উভয়ের ওপর লানত বর্ষিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে হিলা করবে এবং যার জন্য হিলা করা হবে, উভয়ের ওপরই লানত বর্ষিত হবে।" [সূত্র : মিশকাত শরীফ।] হযরত উমর (রাযি) এর যুগে আইন ছিল, যদি কেউ এভাবে হিলা করতো, তবে তাকে সাঙ্গেসার করা হতো অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে তাকে মেরে ফেলা হতো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার চাচাত বোনকে বিবাহ করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাকে তিন তালাক দিয়েছে, এখন আবার হিলা করে তাকে স্ত্রীরূপে রাখতে চায়। তিনি ফাতাওয়া দিয়েছিলেন, তোমার চাচাত ভাই একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে আল্লাহপাকের নাফরমানি করেছে। আল্লাহ তাকে এই শাস্তি দিয়েছেন। সে শয়তানের তাবেদারি করেছে, তাই আল্লাহপাক তার জন্য আর কোন পথ বাকি রাখেন নি। সকল ইমামগণের ফাতাওয়াই এরূপ যে, শর্ত করে হিলা করা হারাম ও গুনাহে কবীরা।

৩৬. দাইয়ুসিয়াত অর্থাৎ নিজের স্ত্রী, বোন বা কণ্যাকে পরপুরুষের সাথে অবাধে দেখা–সাক্ষাত, মেলা–মেশা করতে দেওয়া, পরপুরুষের বিছানায় যেতে দেওয়া জঘন্য কবীরা গুনাহ ও হারাম। এটা জাহিলিয়্যাতের যুগের একটি জঘন্য পাপ, যা ইউরোপ–আমেরিকার বর্বরতা ও আধুনিক সভ্যতার যুগে আবার চালু হয়েছে। এটা অতি জঘন্য পাপপ্রথা ও ভয়াবহ কবীরা গুনাহ।

৩৭. ঘোড় দৌড় বা রেস খেলা কবীরা গুনাহ। যেহেতু এতে বাজি ধরা হয়েছে। আর যাতে বাজি ধরা আছে, তা জুয়া। অতএব, এটা হারাম ও মহাপাপ।

৩৮. সিনোমা, টিভি ইত্যাদি দেখা কবীরা গুনাহ। কারণ, এর মধ্যে উত্তেজনামূলক ছবি দেখানো হয়, যদ্দারা যুবকদের স্বাস্হ্য নষ্ট, সময় নষ্ট, সম্পদ নষ্ট, স্বভাব নষ্ট ও মাতৃজাতির অবমাননা করা হয় এবং হায়া–শরম যা দ্বীনের ওপর কায়িম থাকার জন্য অপরিহার্য, তা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য এটা জঘন্য পাপ। সিনেমার পার্ট ও প্লে করা, সিনেমার ব্যবসা করা, এর এডভার্টাইজিং করা সবই কবীরা গুনাহ ও মহাপাপ।

৩৯. পেশাব করে পানি না নেওয়া ও পাক-পবিত্র না হওয়া কবীরা গুনাহ। পেশাবের ছিঁটা-ফোটা থেকে বেঁচে না থাকার দরুন কবর আযাব হয়।হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে গিয়েছন। খৃষ্টানরা পেশাব করে পানি ব্যবহার করে না। পশুর মতো দাঁড়িয়ে পেশাব করে। তাদের দেখাদেখি যারা তদ্রূপ করে তারা বড়ই হতভাগ্য।

৪০. চোগলখুরি করা ও কূটনামী করা কবীরা গুনাহ।

৪১. গণকের কাছে যাওয়া মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ।

৪২. মানুষের বা অন্য কারো জীবের ফটো আদর-যত্নসহকারে ঘরে রাখা বা টাঙ্গানো কবীরা গুনাহ।

৪৩. পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরা কবীরা গুনাহ।

৪৪. পুরুষের জন্য রেশমী পোষাক পরা কবীরা গুনাহ।

৪৫. মেয়েলোকের জন্য শরীরের রূপ প্রকাশ পায়, এমন পাতলা লেবাস পরা কবীরা গুনাহ। তেমনি কোন অঙ্গের অংশবিশেষ বের করে সংক্ষিপ্ত পোষাক পরা বা অঙ্গের পরিধি ফুটে ওঠার মতো আঁটসাঁট পোষাক পরাও কবীরা গুনাহ।

৪৬. পুরুষের জন্য লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট পায়ের গিরার নিচে পরা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন, "মাটির উপর দিয়ে গর্বভরে বিচরণ করো না।" তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহর নিকট মানুষের অহংকার ও ফখর অত্যন্ত অপছন্দনীয়।"

হাদীস শরীফে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। তাদের সাথে মেহেরবানির কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তারা হলো-১.যে অহংকারের সাথে লুঙ্গি-পায়জামা টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরবে, ২.যে উপকার করে খোঁটা দিবে, ৩.যে মিথ্যা কসম খেয়ে জিনিস বিক্রয় করবে।

৪৭. বংশ পরিবর্তন করা অর্থাৎ বাপের নাম বদলিয়ে দেওয়া (যে কোন মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে) কবীরা গুনাহ।

৪৮. ঝগড়া-বিবাদ করে মিথ্যা মুকাদ্দমা দায়ের করা কবীরা গুনাহ। মিথ্যা মুকাদ্দমার তদবির করা জায়িয আছে, কিন্তু জেনে-শুনে মিথ্যা মুকাদ্দমা করা বা তার পায়রবি করা কিংবা মিথ্যা পরামর্শ দিয়ে মিথ্যা মুকাদ্দমা সাজিয়ে দেওয়া কবীরা গুনাহ। সত্য মিথ্যা না জেনে মুকাদ্দমার তদবির করাও দুরস্ত নয় এবং মুকাদ্দমায় জিতিয়ে দিব-এই চুক্তিতে মুকাদ্দমার তদবির করা জায়িয নয়।

৪৯. মৃত ব্যক্তির জায়িয ওসিয়ত পালন না করা কবীরা গুনাহ। অবশ্য ওসিয়ত শরী'আতসম্মত হওয়া চাই। শরী'আতবিরোধী ওসিয়ত করাও কবীরা গুনাহ এবং তা পালন করাও কবীরা গুনাহ।

৫০. কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়া কবীরা গুনাহ।

৫১. জাসূসী করা অর্থাৎ মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রের গোপন কথা বা দুর্বল পয়েন্টের কথা অন্য সমাজের লোকের কাছে, অন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ।

৫২. নর হয়ে নারীর বেশ ধারণ করা এবং নারী হয়ে নরের বেশ ধারণ করাও কবীরা গুনাহ। শুধু বেশ নয়, নারী হয়ে নরের সমান অধিকারের দাবি করে দরবারে, মাঠে-ময়দানে এবং হাটে-বাজারে অবাধ বিচরণ করা, আর নর হয়ে অক্ষম সেজে ঘরে বসে থাকা-এটাও এরই পর্যায়ভুক্ত।

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "সেসব নারীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ, যারা নরের বেশ ধারণ করবে এবং সেসব নরের ওপর যারা নারীর বেশ ধারণ করবে।"

৫৩. টাকা বা নোট জাল করা কবীরা গুনাহ।

৫৪. অন্তর এত শক্ত করা যে, গরিব-দুঃখীর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট দেখেও দরদ লাগে না, এটাও কবীরা গুনাহ।

৫৫. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় ত্রুটি করা এবং দেশের জরুরী রসদ, খাদ্য বা হাতিয়ার চোরাচালান বা পাচার করা কবীরা গুনাহ।

৫৬. রাস্তা-ঘাটে বা ছায়াদার ফলদার বৃক্ষের নিচে পায়খানা করা কবীরা গুনাহ।

৫৭. ঘরবাড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গা, আসবাবপত্র, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, ইত্যাদি নোংরা বা গান্ধা করে রাখা কবীরা গুনাহ।

৫৮. হায়িয-নিফাস অবস্হায় স্ত্রী-সহবাস করা কবীরা গুনাহ।

৫৯. যাকাত না দেওয়া কবীরা গুনাহ।

৬০. ইচ্ছা করে এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করা কবীরা গুনাহ।

৬১. মাহে রামাযানের একদিনেরও রোযাও বিনা ওজরে ভেঙে ফেলা বা না রাখা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ।

৬২. জনগণের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর জন্য জীবিকা নির্বাহোপযোগী খাদ্য-দ্রব্য গোলাজাত করে আটক করে রাখা কবীরা গুনাহ।

৬৩. ষাঁড় দ্বারা গাভীর বা পাঁঠার দ্বারা ছাগীর পাল দিতে না দেওয়া কবীরা গুনাহ।

৬৪. পড়শীকে কষ্ট দেওয়া (যদিও সে ভিন্ন জাতির হয়) কবীরা গুনাহ।

৬৫. যার মাল আছে, যার মাল উপার্জন করার শক্তি আছে, এমন লোকের লোভের বশীভূত হয়ে দান প্রার্থী হওয়া অর্থাৎ ভিক্ষা করা কবীরা গুনাহ। এরূপ পেশাদার ভিক্ষুককে জেনেশুনে ভিক্ষা দেওয়াও কবীরা গুনাহ।
৬৬. জনগণ চায় না, তা সত্ত্বেও তাদের ইমামত ও নেতৃত্ব করা কবীরা গুনাহ।
৬৭. নিজের দোষ না দেখে পরের দোষ দেখে বেড়ানো এবং গর্বের সাথে নিজের প্রশংসা করা কবীরা গুনাহ।
৬৮. বদগুমানী করা অর্থাৎ বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে অন্য মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কবীরা গুনাহ।
৬৯. ইলমে দ্বীনকে তুচ্ছ মনে করে ইলমে দ্বীন হাসিল না করা বা হাসিল করে আমল না করা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ। তেমনিভাবে সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা না দেওয়া কবীরা গুনাহ।
৭০. বিনা জরুরতে লোকের সামনে সতর খোলা কবীরা গুনাহ। পুরুষের সতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের সতর বেগানা পুরুষের সামনে মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর। আর নিজের মাহরামের সামনে বুক হতে হাঁটু পর্যন্ত সতর। তাই মাহরামের সামনে নারীর পেট এবং পিঠও খোলা থাকতে পারবে না।
৭১. মেহমানের খাতির, আদর-যত্ন ও অভ্যর্থনা না করা কবীরা গুনাহ।
৭২. ছেলেদের সঙ্গে কু-কর্ম করা তথা পুংমৈথুন করা মহাপাপ। এটা অত্যন্ত মারাত্মক কবীরা গুনাহ।
৭৩. আমানতদার যোগ্য সৎকর্মীকে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত না করে আত্মীয়তা, দলীয় বা অন্য কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বা জনস্বার্থে অমনোযোগী হয়ে অযোগ্য, অসৎ ও অকর্মাকে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত করা কবীরা গুনাহ।
৭৪. নিজে ইচ্ছা করে বা দাবি করে অথবা জোর করে কোন পদ গ্রহণ করা কবীরা গুনাহ।
৭৫. ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধী বা বিদ্রোহী হওয়া কবীরা গুনাহ।
৭৬. নিজের বিবি-বাচ্চার খবর-বার্তা না নিয়ে তাদেরকে দুনিয়াবি ব্যাপারে কষ্টে ফেলা, কিংবা পরকালীন ব্যাপারে খারাপ ও নষ্ট হতে দেওয়া কবীরা গুনাহ।
৭৭. খতনা না করা কবীরা গুনাহ।
৭৮. অসৎ ও অন্যায় কাজ হতে দেখে শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বাধা না দেওয়া, কিছু না বলা কবীরা গুনাহ। অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা এবং তা প্রতিরোধের ফিকির না করা ঈমানের পরিপন্হী।

৭৯. অন্যায়ের সমর্থন করা কবীরা গুনাহ। অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা মারাত্মক কবীরা গুনাহ ও কুফর।
৮০. আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ।
৮১. স্ত্রী সহবাস করে গোসল না করা কবীরা গনাহ।
৮২. পেশাব-পায়খানা করে ঢিলা বা পানি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল না করে অপবিত্র থাকা কবীরা গুনাহ।
৮৩. পুরুষ-মহিলার নাভীর নিচের পশম, বগলের পশম, নখ ইত্যাদি বর্ধিত করে রাখা কবীরা গুনাহ। তেমনিভাবে পুরুষের জন্য দাড়ি মুন্ডিয়ে মেয়েলোক সাজা এবং স্ত্রীলোকের জন্য মাথার চুল কেটে পুরুষ সাজা কবীরা গুনাহ। পুরুষদের দাড়ি লম্বা রাখা এবং স্ত্রীলোকদের মাথার চুল লম্বা রাখা ওয়াজিব। নারী-পুরুষ উভয়ের নাভীর নিচের পশম ও বগলের পশম পরিষ্কার করে ফেলা ওয়াজিব।
৮৪. উস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বেয়াদবি করা, কুরআন ও হাদীসের আলেম বিশেষভাবে কুরআনের হাফেযের অমর্যাদা করা কবীরা গুনাহ। যিনি কুরআন-হাদীসের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেন, তাকেই পীর বলে। আর উস্তাদ বলে, যিনি কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক অর্থ শিক্ষা দেন। উস্তাদ ও পীর উভয়েরই বড় হক। এরূপে যারা কুরআন শরীফ হিফয করে হাফেয হন বা কুরআন-হাদীসের অর্থ ও মর্ম আসল আরবী ভাষায় পাঠ করে বুঝে আমল করেন এবং মানুষকে তদানুযায়ী আমল করতে উপদেশ দেন, তাঁরা অনেক মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের প্রতি যারা আন্তরিক মর্যাদা প্রদর্শন করে না, তারা মহাপাপী।
৮৫. শূকরের গোশত খাওয়া মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ। এ কথা বলার দরকার ছিল না, যেমন দরকার নেই এ কথা বলার যে, মল-মূত্র ভক্ষণ করা মহাপাপ। কিন্তু যেহেতু শোনা যায় যে, যারা ইংল্যান্ড-আমেরিকায় যায়, তারা নাকি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ শূকরের গোশত খেতে পরোয়া করে না। সেজন্য এ কথাটাও লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।
৮৬. হস্তমৈথুন করা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ।
৮৭. ঘাঁড়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদি লড়াইয়ের আয়োজন করা এবং তামাশা দেখা কবীরা গুনাহ।
৮৮. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া।
৮৯. কোন জীবন্ত ও জানদার জীবকে আগুন দিয়ে জ্বালানো কবীরা গুনাহ। তবে সাপ, বিচ্ছু, ভীমরুল, বল্লা ইত্যাদি দুষ্ট ও কষ্টদায়ক জীব হতে বাঁচার যদি কোন উপায় না থাকে, তবে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করায় আশা করা যায় যে, কোন গুনাহ হবে না।

৯০. আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ।
৯১. আল্লাহর আযাব হতে নির্ভীক হওয়া কবীরা গুনাহ।
৯২. হালাল জানোয়ারকে আল্লাহর নামে যবেহ না করে অন্য উপায়ে মেরে খাওয়া বা যে জীব নিয়মতান্ত্রিক যবেহ ব্যতীত কোন আঘাতে বা অন্য কোন উপায়ে মরে গেছে, উক্ত মৃত জীব খাওয়া কবীরা গুনাহ।
৯৩। অপচয় বা অপব্যয় করা কবীরা গুনাহ।
৯৪। কৃপনতা ও বখিলী করা কবীরা গুনাহ।
৯৫। রাষ্টীয় ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রবর্তন বা জারি না করা, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অনৈসলামিক আইন সমর্থন করা বা জারি করা কবীরা গুনাহ।
৯৬। ইসলামের আইন মুতাবিক আইন-কানুন জারি হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রের কোন আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা কবীরা গুনাহ।
৯৭। ডাকাতি করা, লুটতরাজ করা বা পকেট কেটে বা হঠাৎ চোখের আড়ালে অসতর্কতার সুযোগে মাল চুরি বা ছিনতাই করা কবীরা গুনাহ।
৯৮। ছোট জাত, ছোট পেশাদার বলে বা জোলা, তেলি, শিকারী, কামার, কুমার, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি বলে কাউকে হেকারত করা বা খাটো করে দেখা কবীরা গুনাহ।
৯৯। বিনা ইজাযতে কারো বাড়ির ভিতরে বা ঘরের ভিতরে বা খাস কামরায় প্রবেশ করা কবীরা গুনাহ। ইজাযতের জন্য সালাম দিয়ে সালামের উত্তর না পাওয়া গেলে ফিরে আসতে হবে।
১০০। পরের দোষ তালাশ করে বেড়ানো কবীরা গুনাহ।
১০১। মানুষের কষ্ট হয়, এমন খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশি হওয়া কবীরা গুনাহ।
১০২। সুরত-শেকেলের কারণে বা গরিব হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে টিটকারি বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কবীরা গুনাহ।
১০৩। বিদ‘আত কাজ করা বা বিদ‘আত জারি করা কবীরা গুনাহ। হযরত আয়িশা (রাযি) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যা দ্বীনের মধ্যে শামিল নয়, তবে ঐ ‘নতুন বিষয়’ প্রত্যাখাত হবে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা জায়িয হবে না। [সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৪, বুখারী শরীফ খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৭১]
১০৪। দুনিয়া হাসিলের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি) হতে বর্ণিত আছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ইলম দ্বারা আল্লাহপাকের রিয়া ও সন্তুষ্টি লাভ করা হয়, এমন ইলমকে যে ব্যক্তি দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ হাসিল করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।" [সূত্র : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃষ্ঠা ৩৪। আবুদ দাউদ শরীফ খন্ড ২ পৃষ্ঠা-৫১৫]

১০৫। ইলম গোপন করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "কারো নিকট ইলমী বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে, উক্ত বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।" [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৪। আবু দাউদ শরীফ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫১৫]

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত 'ইলমী বিষয়' দ্বারা কুরআন হাদীস ও দ্বীনি মাসআলার কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনি বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। [সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৪।]

১০৬। জাল হাদীস বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি) থেকে বর্ণিত আছে, "হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে অর্থাৎ জাল হাদীস বর্ণনা করে, সে যেন দোযখে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"

১০৭। গুনাহের কাজে মান্নত মানা কবীরা গুনাহ। গুনাহের কাজে মান্নত মানা যেমন গুনাহ, তা পূরণ করাও গুনাহ। তথাপি যদি কেউ কোন গুনাহর মান্নত মেনে থাকে, তাহলে তার কর্তব্য হচ্ছে, সে যেন তা পূরণ না করে, বরং কাফফারা আদায় করে দেয়। তার কাফফারা কসমের কাফফারার মতো।

১০৮। প্রজাদের অধিকার খর্ব করা। জনগণের হক আদায় না করা কবীরা গুনাহ। হযরত মা'কাল বিন ইয়াছার (রাযি) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুসলমানদের মধ্য হতে কেউ জনগণের শাসক হওয়ার পর যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে স্বীয় জনগণের অধিকার খর্বকারী ছিল অর্থাৎ তাদের দ্বীন ও দুনিয়াবি কল্যাণের ব্যবস্থা করেনি, তবে আল্লাহপাক অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।" [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩২১। বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৫৯]

১০৯। অবৈধ ট্যাক্স আদায় করা কবীরা গুনাহ। হযরত উকবা বিন আমের (রাযি) হতে বর্ণিত আছে, "অবৈধ ট্যাক্স আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

শরী‘আতের দৃষ্টিতে কাষ্টম চার্জ, নগর শুল্ক ও আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) ইত্যাদি আদয় করা জায়িয নয়।
১১০। ঋণী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা কবীর গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ঋণ ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-২৫২। মুসলিম শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৫]
উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ করে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা পরিশোধ না করে বা পরিশোধের কোন ব্যবস্থাও না করে শাহাদত বরণ করে, তবে শাহাদতের কারণে তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হলেও তার ঋণ ক্ষমা করা হবে না। কারণ সেটা বান্দার হক।
১১১। দু’মুখো স্বভাব ইখতিয়ার করা কবীরা গুনাহ। হযরত আম্মার (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “দুনিয়াতে যার দু’মুখো স্বভাব থাকবে, কিয়ামতের দিন তার জিহবা হবে আগুনের”। [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৪১৩, সুনানে দারেমী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৫]
১১২। মহিলাদের খুশবু লাগিয়ে বের হওয়া কবীরা গুনাহ। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “গাইরে মাহরাম বা পরপুরুষকে দর্শনকারী সকল চক্ষুই ব্যভিচারিণী। আর মহিলার যদি খুশবু লাগিয়ে কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে, তবে সে এরূপ [এরূপ বলার দ্বারা ব্যভিচারিণী বোঝানো উদ্দেশ্য]”। [সূত্র : আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৪]
সুতরাং মহিলাদের বিশেষ জরুরতে পর্দা সহকারে বের হওয়া জায়িয থাকলেও খুশবু মেখে বের হওয়া জাযিয নয়।
১১৩। বিজাতিদের অনুকরণ করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি অন্য কোন কওমের অর্থাৎ অমুসলিমদের রীতি-নীতির অনুকরণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে”।
অথাৎ যে ব্যক্তি কর্ম, বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং কিয়ামতে তাদের সাথে হাশর হবে।

১১৪। গোঁফ বড় করে রাখা কবীরা গুনাহ। হযরত যায়েদা বিন আরকাম (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ ছাটবে না, সে আমাদর দলভুক্ত নয়"।

যারা বড় বড় গোঁফ রাখে এবং ছোট করাকে মর্যাদার খেলাফ মনে করে, তারা উভয় হাদীস হতে শিক্ষা গ্রহণ করুক। উল্লেখ্য, মোচ বড় বড় রাখা হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি।

১১৫। কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন, (নিজে বা অন্যের দ্বারা কৃত্রিম) চুল সংযোজনকারিণীর ওপর এবং নিজে বা অপরের দ্বারা শরীর খোদাই করে বা নকশা বা ছবি অংকনকারিণীর ওপর । [সূত্র : আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২০]

আজকাল আমাদের দেশে কিছু মহিলা ও পুরুষদেরকে দেখা যায় যে, তারা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে থাকে। যারা এরূপ করবে তারা উপরোক্ত হাদীসের বর্ণিত অভিশাপের অন্তর্ভূক্ত হবে।

১১৬। অভিশাপ দেয়া কবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মু'মিন কখনো অভিসম্পাতকারী হতে পারে না"। [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৪১৩। তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২]

১১৭। অহেতুক কুকুর পোষা কবীরা গুনাহ। হযরত আবু তালহা (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এমন ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি আছে"। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৮০, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৮৫।]

১১৮। ছবি তৈরি করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহপাকের কাছে সর্বাধিক শাস্তিযোগ্য অপরাধী ব্যক্তি হলো, চিত্র অংকনকারী বা ছবি তৈরিকারী"। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৯, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৮৫।]

শরী'আত সম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে হাতে ছবি অংকন করা বা ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা অর্থাৎ যে কোন উপায়ে কোন প্রাণীর ছবি তৈরি করা বা করানো সম্পূর্ণ হারাম। তবে বৃক্ষ, ফলফুল, পাহাড়, মসজিদ ইত্যাদি ছবি তৈরি করা হারাম নয়।

১১৯। মাতম ও শোক প্রকাশ করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কারো মৃত্যুতে মাতম করে, মুখে আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়্যাতের অর্থাৎ জাহিলী যুগের উক্ত প্রথাকে অনুসরণ করে এবং তা সকলেই করে বলে দোহাই দেয়"। [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৫০। বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯৯]

১২০। একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরা (য়াযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তির যদি একাধিক স্ত্রী থাকে, আর সে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করে, তবে কিয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় হাজির হবে"। [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-২৭৯।]

১২১। সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনাকারীদের দেখবে, তখন তাদেরকে বল সাহাবা ও তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তাদের ওপর আল্লাহপাকের লানত হোক"। [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৫৫৪। তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৫]

এ কথা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সমালোচকদের মধ্যে সমালোচকরাই নিকৃষ্ট। সুতরাং সমালোচকদের ওপর লানত বর্ষিত হবে।

১২২। হাক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বরেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা রাখে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করছি"। [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯৭।]

যে সকল ব্যক্তি ইখলাসের সাথে দ্বীনের ইলম ও আমলের মধ্যে লিপ্ত তারাই আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা চরম দুর্ভাগ্যের কথা। আল্লাহপাক স্বয়ং এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ) লিখেছেন যে, আলেম বিদ্বেষীদের কবরে রাখার পর তাদের চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। [সূত্র : মা'আরিফে আকাবির, পৃষ্ঠা-৪০১]

১২৩। বিনা দাওয়াতে আহার করা কবীরা গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "কাউকে দাওয়াত করা হলে, সে যদি বিনা উজরে তা কবুল

না করে, তবে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া এসে খানায় অংশগ্রহণ করে, সে যেন চোর হয়ে ঘরে প্রবেশ করলো এবং ডাকাত হয়ে বের হয়ে গেল"। [সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা–২৭৮।]

উল্লেখ্য, বিয়ের সময় মেয়ের বাপের বাড়িতে বরের সাথে ২/৪ জন লোক খাওয়াতে অংশগ্রহণ করা দূষণীয় কিছু নয়। কিন্তু বর্তমানে প্রথা প্রচলিত হয়েছে যে, বরের সাথে বহুসংখ্যক লোকজন শর্ত করে মেয়ের বাপের বাড়িতে খাওয়ার মধ্যে শরীফ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের পিতা জমি বিক্রি করে বা জমি বন্ধক রেখে বা সুদের ওপর ঋণ গ্রহণ করে দাওয়াতের আয়োজন করে থাকে। মেয়ের বাপের বাড়িতে এ ধরনের খাবার মজলিসের কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না। এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের খানাকে বুযুর্গানে দ্বীন ডাকাতির খানা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর থেকে পরহেজ করা জরুরী। স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন মুসলমানের মাল তার অন্তরের পুরোপুরি সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের জন্য কখনো হালাল হয় না।

পাপ কাজে দুনিয়ার ক্ষতি

নেক কাজ করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে–আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা ও আখিরাতের সুখ লাভ করা এবং পাপকাজ হতে বেঁচে থাকার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আখিরাতের আযাব ও খোদার গযব হতে মুক্তিলাভ করা। কিন্তু আজকাল সাধারণত লোকেরা দুনিয়ার লাভ লোকসানটাকেই বেশি বুঝে। তাই পাপ করলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করলে দুনিয়াতে কি কি লাভ হয়, তার কিছু বর্ণনা এখানে দেয়া হল। আশা করা যায় যে, লোকেরা অন্তত দুনিয়ার লাভের আশায় কিছু নেক কাজ করবে এবং দুনিয়ার লোকসানের ভয়ে পাপ কাজগুলো ত্যাগ করবে।

পাপ করার দরুন যেসব ক্ষতি হয় তা নিম্নরূপ

১. দ্বীনী ইলম হতে মাহরুম ও বঞ্চিত থাকতে হয়। ২. কামাই রোযগারের বরকত উঠে যায়। ৩. খোদার প্রতি মুহাব্বত থাকে না। ৪. সৎলোকের কাছে যেতে ইচ্ছা হয় না। ৫. কাজে-কর্মে অনেক বাধা-বিঘ্ন এসে পড়ে। ৬. অন্তর কাল হয়ে যায়। ৭. হৃদয়ের বল থাকে না।৮. নেক কাজ হতে মাহরুম থাকতে হয়।৯. হায়াত কাটা যায়। ১০. এক গুনাহের পর অন্য গুনাহ সংঘটিত হতে থাকে, তওবা করবার ইচ্ছা ক্রমশ কমজোর

হতে থাকে। ১১. কিছু দিন পর পাপের প্রতি যে একটা ঘৃণা ছিল, সেটাও চলে যায়। ১২. মন্দ কাজে নমরুদ, শাদ্দাদ, ফিরআউন, আবু জাহল প্রমুখ আল্লাহর দুশমনদের উত্তরাধিকারী ও সহগামী হতে হয়। ১৩. আল্লাহর নিকট মান-সম্মান কিছুই থাকে না। ১৪. অন্যান্য জীবজন্তু পাপের দরুন কষ্ট পেয়ে পাপীর প্রতি লা'নত করে। ১৫. জ্ঞান-বুদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। ১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদ দু'আর ভাগী হতে হয়। ১৭. ফেরেশতাদের নেক দু'আ হতে মাহরুম থাকতে হয়। ১৮. দেশের শস্য-ফসলাদিতে বরকত থাকে না। ১৯. শরম-ভরম চলে যায়। ২০. আল্লাহ তা'আলার ভক্তি অন্তর হতে উঠে যায়।২১. আল্লাহর নেয়ামত হতে মাহরুম হয়ে যায়। ২২.বালা-মুসীবত নাযিল হয়। ২৩. তাঁকে প্রশংসাস্থলে নিন্দা করা হয়। ২৪. শয়তান তার চিরসাথী হয়ে যায়। ২৫. তার দিল পেরেশান থাকে। ২৬. মৃত্যুকালে তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হয় না। ২৭. খোদা তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে অবশেষে তাওবা ব্যতিরেকেই তার মৃত্যু হয় ইত্যাদি।

নেক কাজে দুনিয়া লাভ

১. নেক কাজ করার ফলে কামাই রোযগারে বরকত হয়। ২. কষ্ট ও অশান্তি দূর হয়।৩. দিলের মকসুদ সহজে পুরা হয়। ৪. জীবনে শান্তি পাওয়া যায়। ৫. দেশে রীতিমত বৃষ্টি হয়। ৬. অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় না। ৭. বালা মুসীবত দূর হয়। ৮. আল্লাহ তা'আলা সকল কাজে মদদগার হন। ৯. নেক লোকের অন্তর নেক কাজের প্রতি মজবুত রাখার জন্য ফেরেশতাদের হুকম করা হয়। ১০. খাঁটি সম্মান পাওয়া যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। ১১. লোকের অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। ১২. কুরআন শরীফ তার জন্য রহমত হয়। ১৩. জানের বা মালের ক্ষতি হলে তার পরিবর্তে উত্তম জিনিস পাওয়া যায়। ১৪. ক্রমশ নেয়ামত বৃদ্ধি পেতে থাকে, মালও বাড়তে থাকে ১৫. দিলে শান্তি আসে। ১৬. আওলাদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে।১৭. জীবিত অবস্থায়ই গাইব হতে সুসংবাদ পাওয়া যায়। ১৮. মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ সুসংবাদ শুনান। ১৯. অভাবের সময় মদদ পাওয়া যায়। ২০. অন্তরের বিশৃঙ্খল চিন্তা-ভাবনা দূর হয়। ২১. রাজত্ব ও কর্তৃত্ব স্থায়ী হয়। ২২. আল্লাহর গজব দূর হয়। ২৩. আয়ু বৃদ্ধি পায়। ২৪. অনাহার ও অর্ধাহারের কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া যায়। ২৫. অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয় ইত্যাদি।

তাওবার বয়ান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعتَذِرُوا اليَومَ ۖ إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ (٧)

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটিভাবে তাওবা কর"।

[সূত্র : সূরা তাহরীম, আয়াত-৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন পবিত্র হয়ে যায় যে, যেন তার কোন গুনাহই নেই"।

[সূত্র : ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৩১৩]

খালিস তাওবা কাকে বলে? জনৈক বুযুর্গ অতি সংক্ষেপে তাওবার ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেছেন, "গুনাহের কারণে মনের ভিতর অনুতাপের আগুণ জ্বলাকেই তাওবা বলে"।

ইবনে মাসউদ (রাযি) বলেন:, "অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা"। [সূত্র : ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৩১৩]

খালিস তাওবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে

১. গুনাহের কাজ স্মরণ করে মনে মনে লজ্জিত হওয়া এব মনের মধ্যে দুঃখ অনুভব করা।

২. সঙ্গে সঙ্গে ঐ অন্যায় কাজ তরক করে দেয়া।

৩. ভবিষ্যতের জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনো এমন কাজ করব না এবং নফস যখন আবার সেই কাজ করার খায়েশ হয়, তখন তাকে দমন করে রাখা। আর খোদার কাছে এমন কাকুতি-মিনতি করে মাফ চাওয়া, যেমনিভাবে মাফ চেয়ে থাকে কোন চাকর যখন সে তার মালিকের নিকট অপরাধ করে ফেলে। সে কাকুতি-মিনতি করে মালিকের হাত জড়িয়ে ধরে, একবারের জায়গায় দশবার করে মাফ চায়। তাই খোদার কাছে অন্তত এতটুকু তো করা উচিত।

আর উক্ত ত্রুটির জন্য তাওবার সাথে সাথে শরী'আতে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিকার শুরু করে দেয়া উচিত। যেমন, নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি আদায় না করে থাকলে, সেগুলো হিসেব করে আদায় করা উচিত। কিন্তু সেগুলোর চূড়ান্ত হিসাব করা সম্ভব না হলে, মনের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হিসাব করে পিছনের সবগুলোর কাযা আদায় শুরু করে দেয়া কর্তব্য। কাযা আদায় শেষ হওয়ার পূর্বে মৃত্যু এসে গেলে সেগুলো আদায় করার জন্য ওসীয়ত করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ না করুন, কারো থেকে কালিমায়ে কুফর বা শিরক প্রকাশ পেলে তার জন্য কালিমা পড়ে নতুনভাবে ঈমান আনতে হবে এবং বিবাহ দোহরাতে হবে। কেউ যদি অন্যের অর্থ অবৈধভাবে নিয়ে থাকে, তাহলে সে অর্থ নিজের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যে পরিমাণ হয়, তা মূল মালিককে পৌঁছে দিবে। মালিক না থাকলে, তার ওয়ারিসদেরকে পৌঁছে দিবে। তাদেরকেও না পেলে মূল মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে গরীব মিসকীনদেরকে দান করে দিবে।

এসব বিষয় খালিস তাওবার জন্য একান্ত জরুরী। এরকম খালিস তাওবা করলে আল্লাহর ওয়াদা আছে যে, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুল করে নিবেন এবং তাওবাকারীকে ক্ষমা করে মুহাব্বত করবেন।

তাওবা কবুলিয়্যত সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যার ভুলবশত মন্দ কাজ করে অনতিবিলম্বে তাওবা করে। এরাই হল সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যার মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে : আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি”। [সূত্র : সূরাহ নিসা, আয়াত ১৭-১৮]

অধ্যায় পাঁচ
ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ
গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী মতবাদ

পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পাঠিয়েছেন খলীফারূপে, তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। জান্নাত হতে নির্বাসিত মানুষ যাতে তার সঠিক সরল পথ ভুলে না যায়, সে জন্য যুগে যুগে এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল (আ)। মানুষের জীবন পদ্ধতির সঠিক রূপরেখা বর্ণনা দিয়ে বহু আসমানী গ্রন্থ এসেছে সেসব নবী-রাসূলগণের (আ) মাধ্যম।

শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের আলোক বর্তিকা দ্বারা জীবন চলার পথ ও পাথেয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে আছে। পবিত্র কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদীস। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধর্ম ও রাজনীতির একই সূত্র-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে ইসলাম। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত ইসলামী মতাদর্শ বাদ দিয়ে কারো ব্যক্তিগত তথা মানব রচিত আইন বা মতবাদ দিয়ে দেশ শাসন করা বা এ জন্য আন্দোলন করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয। অথচ কমিউনিজম এবং সোস্যালিজমের নেতার কথার বুলি আওড়াতে গিয়ে বলে থাকে, “ইসলাম মানব জাতিকে যে সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়েছে, আমরা জাতিকে সেই সাম্যবাদের দিকেই আহবান করি। সমতার দিক দিয়ে ইসলামের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই; বরং ইসলামের শিক্ষাকেই আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই সাম্যবাদের মাধ্যমে”।

উক্ত নেতাদের এসব বক্তব্য-বিবৃতি ষোল আনাই ধোকা, সত্যের অপলাপ এবং মধুর নামে বিষ পান করানোর অপচেষ্টা মাত্র। শরী‘আতের দৃষ্টিতে প্রচলিত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রচার করা হারাম। কারণ, বর্তমান গণতন্ত্রও সমাজতন্ত্র উভয়ই ইসলাম বিরোধী মতবাদ। তেমনিভাবে জাতীয়তাবাদের শ্লোগান আরেক শরী‘আতবিরোধী আওয়ায। আর ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে তো কোন ধর্মই নেই।

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে–“জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস”। গণতন্ত্রের মর্মবাণীঃ Govt. of the people by the people for the people. সরকার জনগণের মধ্য হতে, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর সমাজতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় পার্টি। জনগণ হয় পার্টির সদস্য। বুঝা গেল, উভয় তন্ত্রেরই মূল বক্তব্য–জনগণ সর্বময় ক্ষমতার উৎস। অথচ ইসলাম সর্বময় ক্ষমতার উৎস বলে স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকে। মোদ্দাকথা, ইসলামের বুনিয়াদ খোদায়ী শক্তির উপর। আর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ জনগণ তথা বস্তুর উপর। মূলভিত্তি হতেই শুরু হয় ইসলামের সাথে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংঘাত। সুতরাং, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী মতবাদ। তাই এতদুভয়ের কোনটাই ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে পারে না।

নেতা নির্বাচনের বেলায় ইসলামের শিক্ষা হল সমাজের আলেম জ্ঞানী ও যোগ্যতাসম্পন্ন দ্বীনদার ব্যক্তিগণের পরামর্শের দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত যোগ্যতর ব্যক্তি শাসনকার্যে নিযুক্ত হবেন। নেতা বা শাসক নির্বাচনের ব্যাপারে অশিক্ষিত, মূর্খ ও নির্বোধ লোকদের রায় বা পরামর্শের কোন মূল্য নেই। জ্ঞানী–গুণীদের দ্বারা শাসক নির্বাচিত হবার পর দেশবাসী সকলেই তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিবে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَـٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِى الأَمرِ مِنكُم ۖ فَإِن تَنـٰزَعتُم فى شَىءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الءاخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا (٥٩)

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য কর। আর যে আমীর আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হুকুম করে, তার অনুগত হও”। [সূত্র: সূরা নিসা, আয়াত ৫৯।]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা আমীরের কথা মেনে চল, যদিও কোন হাবশী নাককাটা গোলামকে (তার যোগ্যতার কারণে) তোমাদের আমীর নির্বাচিত করা হয়”। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ। খন্ড –২, পৃষ্ঠা ৩০০]

মোট কথা হুকুমতের কোনো দায়িত্বে আসার জন্য অনেকগুলো শর্ত আছে।

১. জরুরত পরিমাণ কুরআন ও হাদীসের ইলম থাকা।

২. দ্বীনদারী ও পরহেযাগারী থাকতে হবে।

৩. সততা ও আমানতদারী থাকতে হবে।

৪. সমাজসেবার মনোভাব ও রেকর্ড থাকতে হবে।

৫. রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে।

৬. উমালায়ে কিরাম ও মুফতীদের সাথে পরামর্শ করার বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

৭. দায়িত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক হতে হবে।

পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে প্রচলিত গণতন্ত্রে এসব শর্ত পাওয়া যায় না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সমাজসচেতন জ্ঞানী লোকদের দ্বারা নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য শিক্ষা দেয় না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে মানতে শিখায়। যদিও সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্বোধ ও বোকা লোকদের হয়।
অথচ পবিত্র কুরআন সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মানার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِى الأَرۡضِ يُضِلّوكَ عَن سَبيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُم إِلّا يَخرُصونَ (١١٦)

“যদি তুমি অধিকাংশের কথা অনুসরণ কর, তাহলে অধিকাংশের রায় তোমাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে”। [সূত্রঃ সূরা আন‘আম, আয়াত ১১৬]
কারণ এটা বাস্তব সত্য কথা যে, দুনিয়াতে সব সময় ভালোর চেয়ে মন্দ বেশি থাকে। যেমন, শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। জ্ঞানীর চেয়ে মূর্খ নির্বোধের সংখ্যা বেশি। এমনিভাবে সৎ লোকের চেয়ে অসৎলোকের সংখ্যা বেশি। এক্ষেত্রে যদি অধিকাংশের রায়ের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে সেখানে নির্বোধ, অশিক্ষিত, অযোগ্য ও অসৎ লোকদের দখলদারিত্ব জয়ী হবে। তাই এ সিদ্ধান্তে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য গণতন্ত্রে শুধু সংখ্যার হিসেবই পরিগণিত হয়, এবং সংখ্যাধিক্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেখানে বিবেক-বুদ্ধির কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। এজন্যে ইসলাম গণতন্ত্রকে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে।
এ সত্যটি না জানার কারণেই অনেকে গণতন্ত্রের জন্য দরদী হয়ে জোর গলায় হাঁকছেন। আবার অনেকে ইসলাম কায়িম করার কথা বলে গণতন্ত্র কায়িম করার পিছনে দৌড়াদৌড়ি ও লেজুড়বৃত্তি করে চলেছেন।

সমাজতন্ত্রের কুফরী দিকসমূহ

সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নাস্তিকতার ওপর। ধর্মদ্রোহিতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করা হল সমাজতন্ত্রের মূল বুনিয়াদ। তাদের ভাষায়-ধর্ম হল উন্নতির পথে বাধা। দোকান বন্ধ করলে, ব্যবসায় ক্ষতি হয়। হজ্ব আদায়ের দ্বারা শারীরিক দুর্বলতা আসে, কাজ-কর্মে বিঘ্ন ঘটে এবং সম্পদ নষ্ট হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন দেনে হালাল হারাম বের করলে, অবৈধ উপার্জনের পথ রুদ্ধ করা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদি নির্মাণ করলে দেশের জমি নষ্ট করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার,

গোটা দেশটা যেন তাদের। আর ধর্মের অনুসারীরা আবর্জনার বোঝা বৈ কিছুই নয়। সুতরাং, তাদের অধিকারের যেন প্রশ্নই উঠে না।
তাইতো সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা 'কার্ল মার্কস' ও তার রূপকার 'লেনিনে'র চিন্তা-ধারার সারমর্ম ছিল- "নিখিল বিশ্বে কোন স্রষ্টা বা খোদা বলতে কিছুই নেই। বরং গোটা বিশ্ব জড়পদার্থের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে"। কমিউনিষ্টদের দাবি হল, "আমরা যেমনিভাবে পৃথিবীর রাজাদেরকে সিংহাসন থেকে নিচে ফেলে দিয়েছি, তেমনিভাবে আকাশের বাদশাহকেও আরশ হতে নীচে নিক্ষেপ করেছি"। (নাউযুবিল্লাহ)।
জার্মানীর একজন নওমুসলিম 'মুহাম্মদ আসাদ' পর্যটক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বচক্ষে যা অবলোকন করেছেন, তা তিনি নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন- সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে বড় বড় পোস্টার ছেপে ষ্টেশন, সড়ক ও টার্মিনালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে চিত্রাকারে দেখানো হয়েছে যে, একজন সাদা দাড়ি বিশিষ্ট আবা পরিহিত দ্বীনদার ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন আসমান থেকে নেমে আসছেন, আর মজদুরদের ইউনিফর্ম পরিহিত কমিউনিষ্ট যুবকরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে নীচে অবতরণ করাচ্ছে। এ ছবির নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের মজদুরগণ এমনিভাবে খোদাকে আরশ থেকে নীচে নিক্ষেপ করেছে"। (নাউযুবিল্লাহ)।
[সূত্র : দি রোড টু মক্কা, পৃষ্ঠা ১৯৯]
সমাজতন্ত্রের উত্থানের পর রাশিয়ায় আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রকৃষ্ট নজীর সুস্পষ্ট। তখন রাশিয়ার ৩১ হাজার মসজিদ ও ২৫,৫০০ মাদরাসার অধিকাংশই ধূলিস্মাৎ করে ফেলা হয়। এমনিভাবে রাশিয়ায় অসংখ্য উলামায়ে কিরামের সমাবেশ ছিল। তাদের মধ্য হতে ৫০,০০০ শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামকে শহীদ করে ফেলা হয়। অবশিষ্টগণ বিভিন্ন দেশে হিজরত করেন। ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত অধ্যায় মুসলমানদের হৃদয়ে দগদগে ঘা হয়ে আছে। কিন্তু সুদীর্ঘ সত্তর বছর দুর্দান্ত প্রতাপে ক্ষমতা ধরে রেখেও কমিউনিস্টরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি।
বস্তুত এ রকম পশুত্ব আর বর্বরতাকে কোন দেশ ও জাতি কোন কালেই সহজে গ্রহণ করেনি। এর প্রমাণ স্বয়ং স্টালিনের ভাষ্য। তিনি মানাটার কনফারেন্সে বর্ণনা করেন- "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আমাদের এত লোক খতম করতে হয় নি, যত লোক খতম করতে হয়েছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে"।
দৈনিক আঞ্জাম ১৩/১১/৬৭ ইং সংখ্যায় চীনের একজন প্রতিনিধি রিপোর্ট করেন যে, "সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা দেড় কোটি জমিদারকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছি"।

বেশি পিছনে যেত হবে না, হাল জামানার আফগানিস্তান এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আফগানিস্তানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার কুখ্যাত লাল ফৌজ সুদীর্ঘ তের বছরে অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ করেছে শত শত মসজিদ-মাদরাসা ধ্বংস করেছে। আজ কমিউনিস্টমুক্ত আফগান এক প্রকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

মোদ্দাকথা সমাজতন্ত্র কখনো ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং তা ইসলামকে নির্মূল করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম তাদের চক্ষুশুল। ইসলামকে চিরতরে ধ্বংসের জন্যই কার্লমার্কস, লেলিন প্রমুখ ইয়াহুদী সন্তানরা সমাজতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা মিথ্যা প্রহসনমূলক চালবাজী খাঁটিয়ে তাদের ইজমকে বাজারজাত করতে চায়। তাই কোন দেশে এই পশু ইজমকে চালু করতে হলে, প্রথম স্তরে সমাজতন্ত্রকে ইসলামী ইনসাফ, আদলে ফারুকী ও খিলাফতে রাশিদার যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে জোরদার প্রচারণা চালানো হয়। তাদের এমনও বলতে শোনা যায় যে, ইসলাম আর সমাজতন্ত্রের শিক্ষা এক, অভিন্ন। শুধু নামে মাত্র পার্থক্য। এ স্বার্থমাখা চিত্তাকর্ষক বুলির কারণে অনেক সরল প্রাণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় স্তরে এসে তারা নানাবিধ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ইসলামের আরকান, ইবাদত ও উলামায়ে কিরামের উপর হালকা হামলা শুরু করে। রেডিও-টেলিভিশন, ড্রামা-পোষ্টার ইত্যাদিতে নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানাবলীকে পরিহাসরূপে উপস্থাপন করা হয়। এতে করে যুব সমাজের মনে ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তারা ধর্মীয় জীবনকে মনে করতে থাকে অন্ধত্ব। সমাজের আলেম ও ধর্মানুরাগী মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা সৃষ্টির জন্য সর্বত্র প্রচেষ্টা চালানো হয়। এমনিভাবে কৌশল স্বরূপ চোর-গুন্ডা, বদমায়িশদেরকে দাড়িওয়ালা, পাঞ্জাবী-টুপি পরিহিত অবস্থায় নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থাপন করে ধর্মীয় লিবাস-পোষাক ও আচার আচরণের প্রতি জনমনে ঘৃণার সৃষ্টি করা হয়।

তৃতীয় স্তরে তারা জনসাধারণ বিশেষ করে যুব সমাজের মনে উলামায়ে কিরামের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে। জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে। নানা কৌশল তখন দেশের প্রবীণ মুসলমান ও উলামায়ে কিরামকে হত্যা করতে শুরু করে দেয়। ধর্মকে আফিম ধরে ধর্মশালা, মসজিদ, মাদরাসা, ধর্মীয় কিতাব-পত্র সমূলে ধ্বংস করতে শুরু করে। ধর্মকে উৎখাত করতে তারা পাশবিকতা ও বর্বরতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে। দুঃসহ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকে শাহাদাত বরণ করেন।

আর অনেকে শেষ সম্বল ঈমানটুকু নিয়ে কোন দেশে হিজরত করতে বাধ্য হন। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ।
সমাজতন্ত্রে বাক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়। যার ফলে যাকাত ও হজ্জের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরীজা বিলুপ্ত হয়। কারণ, মালের ব্যক্তি মালিকানা না থাকলে, যাকাত ও হজ্জ কিরূপে বিধিবদ্ধ হবে? তাই সমাজতন্ত্রের মূল থিউরীতে বিশ্বাসী কোন মানুষ মুসলমান থাকতে পারে না। বরং সে ধর্মদ্রোহী কাফিরে পরিণত হয়। এটাই সমাজতন্ত্রের স্বার্থকতা।
দেশ ও জনগণের জন্য শান্তির কোন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে করতে পারে না, তা আজ বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সমাজতন্ত্র যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, সে সত্য আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। হালের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এর চাক্ষুষ প্রমাণ।
বর্তমান সভ্যতার দু'টি ভাগ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। মানবতাবিরোধী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে গুটিকয়েক লোকের হাতে দেশের সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এ কারণেই পুঁজিবাদের চরম পর্যায়ে জন্ম নেয় সমাজতন্ত্র। কাজেই দেখা যায়– পুঁজিবাদ তথা গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণেই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। পুঁজিবাদ তথা গণতন্ত্রের অসারতার পর সমাজতন্ত্র যেহেতু প্রাণহীন লাশ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আর তার ধ্বজাধারীরা আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান, তারা অনুশোচনা করছে অতীতের ভুলের জন্য।
সুতরাং, এ দু'টি মতবাদের কোনটিই মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। বরং এগুলো বিপর্যয় ও জাতি ধ্বংসের যাঁতাকল মাত্র।
অতএব, একথা সহজেই অনুমেয় যে, ইসলাম বহির্ভূত মানবীর সকল মতবাদ মরীচিকা তুল্য। ইসলাম ব্যতীত কোন রাস্তাই কল্যাণকর নয়। তাই গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের সদল বলে ইসলামের শান্তিময় পতাকা তলে ফিরে আসা উচিত। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার তাওফীক দান করুন।

কুরআনের আলোকে গণতন্ত্রের অসারতা

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে, প্রচলিত গণতন্ত্র অসার ও ভিত্তিহীন। দ্বীন ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে বর্তমান গণতন্ত্রের বা নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বাতুলতা ও ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে কুরআনে কারীমের বহু স্থানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে:

১. “আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়”।

[সূত্র : সূরাহ ইউসুফ, আয়াত-১০৩]

২. “কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্হাপন করে না”।

[সূত্র : সূরাহ মু‘মিন, আয়াত-৫৯]

৩. “তাদের অধিকাংশেরই বিবেক-বুদ্ধি নেই”।

[সূত্র : সূরাহ মায়িদা]

৪. “কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞান রাখে না”।

[সূত্র : সূরাহ ইউসুফ, আয়াত-৫৮]

৫. “কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ”।

[সূত্র : সূরাহ আন‘আম, আয়াত-১১১]

৬. “কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য দ্বীনে নিস্পৃহ”।

[সূত্র : সূরাহ যুখরুফ, আয়াত-৭৮]

৭. “তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান”।

[সূত্র : সূরাহ মায়িদা, আয়াত-৫৯]

৮. “তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ ও অনুমানের উপর চলে। অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না”।

[সূত্র : সূরাহ ইউনুস, আয়াত-৩৬]

৯. “নিশ্চয় বহুলোক আমার মহাশক্তির ব্যাপারে উদাসীন”।

[সূত্র : সূরাহ ইউনুস আয়াত-৩৬]

১০. “তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী”।

[সূত্র : সূরাহ আরাফ, আয়াত-১০]

১১. “তাদের পূর্বেও অধিকাংশ লোক বিপথগামী হয়েছিল”।

[সূত্র : সূরাহ সাফফাত, আয়াত-৭১]

১২. “তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। সুতরাং, তারা বিশ্বাস করবে না”।

[সূত্র : সূরাহ ইয়াসীন, আয়াত-৭]

১৩. “অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি”।

[সূত্র : সূরাহ হজ্ব, আয়াত-১৮]

১৪. “আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে বহুবার সামান্য দল বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হয়েছে”।

[সূত্র : সূরাহ বাকারাহ, আয়াত-২৪৯]

১৫. “হুনাইনের দিনে তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন-যখন তোমাদের আধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু আল্লাহর ফায়সালার মুকাবিলায় তা কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও তোমাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তোমরা পলায়ন করেছিলে”।

১৬. “আপনি বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয় ; যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে”।

[সূত্র : সূরাহ আল মায়িদা, আয়াত-১০০]

১৭. “যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথা বলে থাকে।
[সূত্র : সূরাহ আন‘আম, আয়াত-১১৬]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, অধিকাংশরই শিক্ষা নেই, জ্ঞান নেই, অধিকাংশ লোকই সত্য সন্ধানী নয়; সতর্কতা ও বিবেক বুদ্ধির অধিকারী নয়; প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী নয়; তারা জান্নাতী হওয়া এবং আখিরাতের শাস্তি বা আজাবের তোয়াক্কা করে না। পবিত্র কুরআন আরো ঘোষণা করছে যে, সংখ্যাধিক্য তথা গণতন্ত্র সত্যের মাপকাঠি হওয়া তো দূরে কথা, এর মূল ও কেন্দ্র বিন্দুতেই রয়েছে গলদ ও ভ্রান্তি। কেননা, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই জাহান্নামের পথে গমনকারী, গুমরাহ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, উদাসীন, আন্দাজপূজারী, সত্যনিস্পৃহ, নির্বুদ্ধিতা সম্পন্ন, অজ্ঞতা ও মূর্খতার শিকার। সুতরাং, এ জন্য তাদের রায়ের দ্বারা কোন সঠিক বা সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেবল সংখ্যাধিক্য ইসলামী মুলনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই একে কোন সমস্যার সমাধান প্রদানের মাপকাঠি মানা যায় না।

অবশ্য হাক্কানী উলামা ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীগণের অধিকাংশের রায়কে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। ইসলামের সোনালী যুগে সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এর ভিত্তিতেই নেয়া হতো।

গণতন্ত্রের কুফরী দিকসমূহ

মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশের কথা মেনে চলেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক-কল্পনার অনুসরণ করে সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক বলে থাকে”। [সূত্র : সূরাহ আন‘আম, অ্যাত-১১৬]

কুরআন কারীমে এমন অনেক গুলো আয়াত রয়েছে, যে সব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রচলিত পশ্চিমা গণতন্ত্র সমর্থন করে না। এর

সামান্য পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলাম সম্পূর্ণ একে অপরের বিপরীত। গণতন্ত্র স্বীকার করলে, কুরআনকে পূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়। আর কুরআনকে পূর্ণভাবে মানলে প্রচলিত গণতন্ত্র স্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেছেন যে, তিনি যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে সর্বযুগে জ্ঞানী,গুনী, বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোকের সংখ্যা কম রেখেছেন। নির্বোধ, অবুঝ ও কম বুদ্ধির লোক বেশী রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন যে, "অধিকাংশ মানুষই মূর্খ"। [সূত্রঃ সূরাহ আন'আম, আয়াত-১১২]
অথচ প্রচলিত গণতন্ত্রে জ্ঞানী-গুণীর বুদ্ধি পরামর্শের আলাদা কোন মূল্যায়ন করা হয় না। একজন বিবেকহীন মানুষের মতামতের যে মূল্য, একজন জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমতেরও সেই মূল্য। যারা বড় বড় পোস্ট ও পদের ব্যাপারে কোন খবরই রাখে না, তাদেরকে সেই ব্যাপারে রায় দিতে বলা হয়। অথচ তাদের মাঝে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার মত বিবেক-বিবেচনা বিদ্যমান নেই। সুতরাং, তারা কখনো ভাল ও যোগ্যতম লোক নির্বাচন করতে পারে না। ফলে তাদের রায়ের ভিত্তিতে অযোগ্য লোকই ক্ষমতায় যাওয়ার বেশী সম্ভাবনা এবং এতে কোন প্রতিষ্ঠান বা দেশ যে সুন্দরভাবে চলতে পারে না, এ কথা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করাও বোকামী।
গণতন্ত্রের ফর্মুলায় বলা হয়েছে যে, "জনগণেরই দ্বারা জনগণেরই জন্য নির্বাচিত।" এ কথাটির মারাত্মক পরিণতি এই যে, গণতন্ত্রের এ ফর্মুলা দ্বারা গণতন্ত্রীগণ বলে থাকেন, জনগণ ক্ষমতার উৎস। অথচ কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, "সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।" [সূত্রঃসূরাহ বাকারা, ১৬৫] সুতরাং, কোন মু'মিন কুরআনের বিরুদ্ধে কোন মতবাদ গ্রহণ করতে পারে না।
তাছাড়া এ পদ্ধতির মাধ্যমে যাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়, তাদের এমন একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক বানানো হয় যে, তারা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এমনকি আল্লাহ তা'আলার কুরআনী বিধানের বিরুদ্ধেও আইন পাশ করতে পারে। তারা যেন সকল প্রকার শরয়ী জওয়াবদিহিতারও উর্ধ্বে। যেমন, শরী'আতে চোরকে হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মদখোরকে জনসমক্ষে ৮০ ঘা বেত লাগানোর হুকুম দেয়া হয়েছে, অবিবাহিত যিনাকারীকে ১০০ ঘা বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম দেশের পার্লামেন্টের সদস্যরা এর কোনটাই বাস্তবায়ন না করে মনগড়াভাবে এর বিরুদ্ধে আইন

পাশ করছে। উপরন্তু তারা কুরআনের বিধানকে সেকেলে ও বর্বর বলে আখ্যায়িত করছে। অথচ কুরআনে কারীমের নির্দেশ অনুযায়ী, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বিধান দেয়ার অধিকার নেই। [সূত্রঃ সূরাহ ইউসুফঃ ৪০] তাই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিধান দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করলে, তাকে বিধানদাতা আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। যেমন : হাদীসে এসেছে, ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয় যে, "তারা তাদের পাদ্রীদেরকে ইলাহ বা মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে।" [সূত্রঃ সূরাহ তাওবা,৩১)
এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা তাদের পাদ্রীদেরকে ইলাহ বা মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে-এর অর্থ এই নয় যে, তারা পাদ্রীদের ইবাদত বা পূজা করতো, বরং তাদের পাদ্রীরা তাদের কিতাবের কতিপয় হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল ঘোষণা করেছিল, আর তারা সেগুলো মেনে নিয়েছিল। এটাকেই বলা হয়েছে, "তারা তাদের পাদ্রীদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে।" [সূত্রঃ তিরমিযী, ২:১৪০/দুররে মনসূর, ৩:২৩০/তাফসীরে মাযহারী, ৪:১৯৪]
এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে অন্য আইন পাশ করে বা কোন কানুন ঘোষণা করে এবং জনগণ তা মেনে নেয়, তাহলে বস্তুত এর দ্বারা বান্দাহকে ইলাহ বানানো হয় এবং বিধানদাতা যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা; সুতরাং, বান্দাহকে বিধানদাতা মানলে, তাকে খোদার আসনে বসানো হয় এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণের মধ্যে অন্যকে শরীক করা হয়, যা শিরকের মধ্যে পরিগণিত। আর তা মহাপাপ এবং নিজের ঈমানের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
তাছাড়া প্রচলিত গণতন্ত্রে বিতর্কিত কোন বিষয়ের সমাধানের জন্য পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয় বা জনগণের মধ্যে নির্বাচন দেয়া হয়, এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কি সিদ্ধান্ত দেয়া আছে, তা ঘুণাক্ষরেও দেখা হয় না। অথচ আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো-কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয়ে গেলে, বা ফায়সালা করাতে হলে, "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।" [সূত্রঃ সুরাহ নিসা-৫৯]
গণতন্ত্রের কোন ঠিকাদারকে যদি বলা হয় যে, এ মতবাদ যখন এতই উত্তম; সুতরাং, তোমরা নিজেদের এলাকায় যেসব স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করো, তার দায়িত্বশীল কে কে হবেন এবং সেটা কিভাবে পরিচালিত হবে, এর জন্য কোন কমিটি বা পরিষদ গঠন না করে তার স্থলে এলাকার সকল শ্রেণীর লোকদেরকে ডেকে ভোট গ্রহণ কর, কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন দরকার নেই। তখনই তাদের থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। তারা কখনো একথা মানবে না যে,

পাবলিকের ভোটে এগুলো নির্ধারণ করা হোক; বরং তারা বলবে যে, মূর্খ লোকেরা এগুলো কি বুঝবে? তাহলে প্রশ্ন হয়, যে পদ্ধতি দ্বারা একজন হেড মাস্টার বা প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা যায় না, সে পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান বা নীতিনির্ধারক কিভাবে নির্বাচিত হতে পারে ? একটা দেশ কি প্রাইমারী স্কুল থেকেও ছোট বা কম গুরুত্ব রাখে? এ ধরনের বহু দিক দিয়ে প্রচলিত গণতন্ত্র কুরআনের সাথে সংঘর্ষশীল এবং সহীহ আকল ও বিবেকের পরিপন্থী।
অপরদিকে শরী'আত এমন সুন্দর বিধান দান করেছে, যার নজীর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারবে না। শরী'আতের নির্দেশ হলো-দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম শ্রেণী ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণের সমন্বয়ে একটি সর্বোচ্চ মজলিসে শুরা বা পরামর্শ পরিষদ থাকবে। যা স্থায়ী হবে, তার কোন সদস্যের বিয়োগ ঘটলে, পরামর্শের ভিত্তিতে তার স্থলে যোগ্য লোক মনোনীত করা হবে। এ মজলিসে শূরা-ই আমীরুল মু'মিনীন (প্রেসিডেন্ট) থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জিম্মাদার (মন্ত্রী) মনোনীত করবেন। এমনকি বিভাগীয় প্রধান, জেলা প্রধান, থানা প্রধানদেরকেও তারা মনোনীত করবেন। তখন প্রচলিত ধোঁকা ও ফাঁকিবাজির নির্বাচনের কোন দরকারই পড়বে না। কোন প্রার্থীর চরিত্র ফুলের মত পবিত্র প্রমাণ করতে পাঁচ দশ লাখ টাকা খরচ করতে হবে না। এত টাকা খরচ করে যদি কেউ পাশ করেও, তাহলে সে জনগণের খিদমতের চেয়ে তার টাকা উসূল করার ফিকিরে বেশি ব্যস্ত থাকবে। শরী'আতে টাকা করচ করে পদ হাসিল করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থনা করবে, শরী'আতের নির্দেশ হচ্ছে-তাকে সে পদ দেয়া হবে না। বরং যোগ্যতম ব্যক্তিকে অনেক সময় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দায়িত্বে বসানো হবে। এর দ্বারা দেশের কোটি কোটি টাকার অপচয় বন্ধ হবে এবং নির্বাচন উপলক্ষে যে শত শত লোকের জান চলে যায়, শত শত মহিলা বিধবা হয়, হাজার হাজার বাচ্চা ইয়াতিম হয়, এসব একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিভাবে আরো অনেক অনিষ্টতা থেকে দেশ হিফাজতে থাকবে।
উল্লেখিত মজলিসে শূরা একটি আইন পরিষদ গঠন করে দিবে। আইন পরিষদের সদস্যরা নিজে কোন আইন প্রণয়ন করবে না, বরং প্রত্যেক বিষয়ের সমাধান কুরআন-সুন্নাহ থেকে খুঁজে খুঁজে বের করবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। [সূত্র: সূরাহ মায়িদাঃ ৩] সুতরাং, মুসলমানদের জন্য নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু কুরআন-সুন্নাহ থেকে খুঁজে বের করবে-এতটুকুর প্রয়োজন অবশিষ্ট আছে। তাও সব বিষয়ে নয়, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মৌলিক

সকল বিষয় এসে গেছে। সমকালীন যুগের কিছু নতুন সমস্যাবলী কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে হয়। কুরআন সুন্নাহ এমন কিতাব যে, এর আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন জরুরত বা সমস্যা উদ্ভুত হবে, তার সমাধান বের করা সম্ভব। কেননা, কুরআন তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সবই তো তাঁর ইলমে আছে। উক্ত মজলিসে শুরা প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ-এর জিম্মাদারও মনোনীত করে দিবেন। তারা আইন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত খোদায়ী কানূন দেশের সর্বত্র জারী করবেন এবং সকল মামলা মুকাদ্দমা, আইন-আদালত উক্ত কানূনের ভিত্তিতে পরিচালনা করবেন, সমাধান দিবেন। **সারকথা,** মজলিসে শূরার মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রধান এসব কাজ আনজাম দিবেন। তাছাড়া যে কোন জটিল সমস্যার সামাধান রাষ্ট্রপ্রধান একা করবেন না; বরং মজলিশে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী করবেন এবং উক্ত মজলিসে শূরা যেহেতু দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ; সুতরাং, রাষ্ট্রপ্রধান বা অন্য কোন বিভাগীয় প্রধান যদি দায়িত্ব পালনে অপারগ হন বা খিয়ানত করেন অথবা ইনতিকাল করেন, তাহলে মজলিসে শূরা তার স্থলে অন্য লোক মনোনীত করবেন।

এ হলো ইসলামী হুকুমত পরিচালনার অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এটা এজন্য পেশ করা হলো, যাতে করে প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামী বিধানের পার্থক্য বুঝতে কিছুটা সহায়ক হয়।

প্রচলিত গণতন্ত্রকে সংক্ষেপে বুঝার জন্য এটাকে বাদশাহ আকবরের ভ্রান্ত মতবাদ তথা দ্বীনে ইলাহীর সাথে তুলনা করা চলে। কারণ, আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ন্যায় এটাও একটা বাতিল মতবাদ বা বাতিল ধর্ম, যা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৈরী হয়েছে। দ্বীনে ইলাহী দ্বারা বাদশাহ আকবর হিন্দু-মুসলমানদের এক করতে চেয়েছিল, আর গণতন্ত্রের এ বাতিল ধর্ম দ্বারা খৃষ্টানরা সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে এক করে তাদের তাবেদার বানাতে চায়। এ বাতিল ধর্মের নীতি-বিধান হলো গণতান্ত্রিক ফর্মুলা এবং এ ধর্মের স্বঘোষিত দেবতা হলো এর ধারক বাহকরা। ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা এ বাতিল ধর্মকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কায়িম করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানগণ দ্বীনী ইলমের অভাবে উন্নত মতবাদ মনে করে এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও কুরআনী বিধানকে বাদ দিয়ে এ বাতিল ও ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা এরূপ যে, যেখানেই গণতন্ত্রের দেবতাদের ধারণায় গণতন্ত্র লংঘিত হচ্ছে, সেখানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তারা বাহিনী পাঠাচ্ছে। তবে কোথাও গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী দল অগ্রসর হলে, দেবতারা সেটাকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাকে তাদের ফর্মুলা

অনুযায়ী অগ্রহণযোগ্য বলছে। তার ধ্বংস সাধনে দেশের সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রা নষ্ট করে দিচ্ছে। এভাবে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা সারা বিশ্বের উপর ছুড়ি ঘুরাচ্ছে এবং প্রভুত্ব করছে। অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানগণ ফির'আউনের যমানার ন্যায় গণতন্ত্রের দেবতাদেরকে বড় খোদা হিসেবে মেনে নিয়েছে। ঐ সব দেবতারা মুসলমানদের থেকে চাঁদা নিয়ে জাতিসংঘের নামে মুনাফেকী করে মুসলিম নিধনে তৎপর আছে। এমন কি তারা এ ঘোষণা দিতেও দ্বিধা করছে না যে, দু'হাজার সাল নাগাদ ইসলাম ধর্মই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা।

অপরদিকে অর্ধশতেরও বেশী মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ নীরব, নির্বিকার। এত কিছুর পরও তারা গণতন্ত্রের দেবতাদেরকে মুসলমানদের খায়েরখা বলে বিশ্বাস করছে। তাদের নিদ্রা কোন ভাবেই ভাংছে না। সমগ্র বিশ্বের এই একই চিত্র। সব জায়গায় মুসলমান মার খাচ্ছে। কাফির-মুশরিক মার দিচ্ছে। আর গণতন্ত্রের ঐসব দেবতাগণ দু'চারটা ফাঁকা বুলি ছেড়ে মুসলমানদের সান্তনা দিচ্ছে।

তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের নামে তারা মুসলমানদেরকে শত শত দলে বিভক্ত করে রেখেছে। অথচ এসব জাতীয়তাবাদ ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের ফায়সালা হচ্ছে, রং বর্ণ, ভাষা, এলাকা ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে ভাগ করা বা খন্ড খন্ড করা কুফরী কাজ এবং জাহিলিয়্যাতের কু-প্রথা। ইসলামের ঘোষণা, মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুক না কেন, সকলেই ভাই ভাই, সকলেই এক জাতি। চাই সে রং, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে যাই হোক না কেন।

[সূত্র: সূরাহ হুজুরাত, ১০/ মা'আরিফুল কুরআন ১: ৬৩/৮: ৪৬৩]

কিন্তু মুসলমানগণ দ্বীনী ইলমের অভাবে এ সবই হজম করে যাচ্ছে। এমনকি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে স্বীকার করতেও আজ মুসলমানরা দ্বিধা বোধ করছে না। অথচ কোন মুসলমান যদি দ্বীন-ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তাহলে সে এক মুহূর্তের জন্যও ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে না। বরং তাকে সর্বক্ষণ ইসলাম ধর্মের পক্ষে থাকতে হবে। ইসলাম ধর্মকে কায়িম করার জন্য জান-মাল, ইজ্জত-আবরু সব কিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। একমাত্র ইসলাম ব্যতীত সে অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদকে স্বীকৃত দিতে পারবে না। বিজাতীয় কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে সে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখতে পারবে না বা তাদের সহযোগিতা করতে পারবে না। কারণ, সে ঈমানের দাবীদার। আর ঈমানের অঙ্গ হলো-আল্লাহর জন্য মুসলমানদের মুহাব্বত করা এবং আল্লাহর জন্য আল্লাহর দুশমনের সাথে দুশমনী রাখা। [সূত্র: বুখারী শরীফ, ১:৬]।

সারকথা, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান বুঝে বা না বুঝে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গণতন্ত্র নামক ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বাতিল মতবাদের বেড়াজালে আটকে পড়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা মনে প্রাণে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ঘৃণা করবো। কোনক্রমেই এটাকে সমর্থন করবো না। কারণ, এটা সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ। অনেকে গণতন্ত্র কায়িমের জন্য বা পুনুরুদ্ধারের জন্য জিহাদ ঘোষণা করে। এটা তাদের মূর্খতা। কারণ, কুফরী মতবাদ কায়িম করার জন্য জিহাদ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা জনগণের ঈমানের হিফাযতের লক্ষ্যে গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের অনিষ্টতা থেকে লোকদের সচেতন করবো। দাওয়াত, তা'লীম ও খিদমতের মাধ্যমে দেশে ইসলামী পরিবেশ কায়িম করবো এবং আল্লাহ তা'আলা যখনই সুযোগ দিবেন, তখনই এসব কুফরী মতবাদ দূরে নিক্ষেপ করে কুরআনী বিধান জারী করবো।

প্রচলিত জাতীয়তাবাদ ইসলাম বিরোধী

এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মানব জাতি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে, যথা-মু'মিন ও কাফির।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখান, ঐ সকল লোকদের পথ যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে। এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। [সূত্র : সূরাহ ফাতিহা, আয়াত- ৫,৬,৭]

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

অর্থ : বলুন, সত্য আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত! অতএব যার ইচ্ছা ইমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক। [সূত্র : সূরা কাহাফ, আয়াত- ২৯]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ

অর্থ : আল্লাহ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির কেউ মু'মিন। (সূরাহ তাগাবুন,২)

মূলত : সমগ্র আদম সন্তান পরস্পরে ভাই ভাই এবং সমগ্র পৃথিবীর মানবকুল একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এবং সূরায় মানব জাতিকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করা এবং ভিন্ন একটি গ্রুপ বা দল সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে কুফর। যে ব্যক্তি কাফির হলো, সে মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করে দিল। সুতরাং, বুঝা গেল যে, সমগ্র মানব জাতির মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি শুধু ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতেই হতে পারে। বর্ণ, ভাষা গোত্র, স্থান ও রাষ্ট্রের মধ্য থেকে কোনটাই মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করতে বা কোন গ্রুপ বা জাতি সৃষ্টি করতে পারে না। একই বাপের সন্তান যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে, কিংবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের পরস্পরের গঠন আকৃতি ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের এই বর্ণ, ভাষা ও স্থানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা পরস্পরে ভাই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারে না।

জাহিলিয়্যাতের যুগে বংশ গোত্রের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করেই জাতিসত্বার মাঝে বিভিন্নতা সৃষ্টি হত। এমনিভাবে রাষ্ট্র ও এলাকার উপর ভিত্তি করে মানুষেরা জাতি-উপজাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে রূপ নিত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে এসব অবাস্তব ভিত্তির মূলোৎপাটন করেন এবং মুসলমান যে কোন দেশের, যে কোন এলাকার, যে কোন গোত্রের এবং যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, সবাইকে একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। যেমন, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-"সমস্ত মু'মিন পরস্পরে ভাই ভাই" (সূরাহ হুজুরাত-১০)। এমনিভাবে কাফির যে কোন রাষ্ট্রের বা যে কোন গোত্রেরই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা একই দলভুক্ত বা অভিন্ন যোগসূত্রে গ্রোথিত।

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবী নবীজীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গী হলেন। মুহাজিরগণের মধ্যে একজন ছিলেন খুবই রসিক প্রকৃতির। তিনি জনৈক আনসারী সাহাবীর কোমরে হাত দ্বারা হালকা আঘাত করলেন। এতে আনসারী সাহাবী অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, তারা নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান করতে লাগলেন। অর্থাৎ আনসারী সাহাবী আনসারগণকে আর মুহাজির সাহাবী মুহাজিরগণকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসত আহবান জানালেন। ইতিমধ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন, তিনি বললেন,

এটা কেমন জাহিলিয়্যাতের আওয়ায! [সূত্র : বুখারী, ১ : ৪৯৯]
যে সকল সাহাবী মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তারা হয়েছেন মুহাজির। আর যারা মদীনায় থেকে মুহাজিরগণকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হয়েছেন আনসার। এতে দোষের কিছুই নেই। বরং এটা তাদের পরিচিতির জন্য জরুরী। কিন্তু এটাকে ভিত্তি করে কোন ব্যাপারে যখনই তারা দুই দলে বিভক্ত হতে যাচ্ছিলেন, তখনই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং এটাকে জাহিলিয়্যাত আখ্যা দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন।
পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস এ কথার পক্ষে প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে শুধু মাত্র কাফির ও মু'মিন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতাকে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কুদরত ও মানুষের সামাজিক জীবনে পরিচয়ের ক্ষেত্রে এক বিরাট ফায়দার বস্তু বলে বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু আদম সন্তানকে তা জাতিভেদ ও দলভেদের ভিত্তি বানানোর অনুমতি দেননি।
ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে দুই জাতির মধ্যে যে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করা হয়, তা একটি ইচ্ছাধীন বস্তুর উপর নির্ভরশীল। কেননা, ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন বস্তু। যদি কোন ব্যক্তি এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে শামিল হতে চায় বা বাতিল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র সহীহ ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তবে সে অনায়াসেই তার আকীদা ও বিশ্বাসকে পাল্টিয়ে উক্ত ধর্মে শামিল হতে পারে। কিন্তু বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, দেশ, ভৌগলিক অবস্থান ও জন্মভূমি প্রভৃতি কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয় যে, সে তার বংশ ও বর্ণকে পাল্টিয়ে দেবে। এ কারণেই কোন ভাষার অধিকারী ও কোন এলাকার বাসিন্দা তাদের ভাষা ও আঞ্চলিকতা পাল্টিয়ে সাধারণত অপর গোত্রের আচার-আচরণ ও ভাষায় সহজেই একাকার হতে পারে না। যদিও সে উক্ত ভাষায় কথা বলতে থাকে এবং উক্ত স্থানের স্হায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়।
এটাই ইসলামী সৌহার্দ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধ- যা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কালো-ধবল, আরব-অনারবের অসংখ্য মানুষকে একই সুত্রে গ্রোথিত করেছে। যাদের শক্তি সামর্থের মুকাবিলা দুনিয়ার কোন গোত্রই করতে পারেনি। তারা বিরাট ঐক্যসমৃদ্ধ বিশ্বব্যাপী ইসলামী জনবলে বলীয়ান ছিলেন।

অতঃপর মানুষ পুনরায় উক্ত জাতীয়তাবাদের কুসংস্কার ও কু-প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের মাধ্যমে নিঃশেষিত করে দিয়েছেন। এ সুযোগে পবর্তীতে, আবার বিধর্মীরা মুসলমানদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে, সীমা-পরিসীমা, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও গোত্রে টুকরা টুকরা করে বিভক্ত করে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত রেখে দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে ইসলামের শত্রুদের আক্রমণের পথ সুগম হয়েছে। যার পরিণতি আমরা আজ চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মুসলমান যারা একই দলভুক্ত ও একটি শরীরের ন্যায় ছিল, তারা আজ ছোট ছোট দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করায় মত্ত হয়েছে। উপরন্তু তাদের মুকাবিলায় সকল তাগুতি শক্তির মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিধর্মীরা সবাই সম্মিলিত জোটরূপে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণে মিল্লাতে ওয়াহিদাহ তথা একই দলবদ্ধ হয়ে কাজ করছে।
[সূত্র :মা'আরিফুল কুরআন, ৮ : ৪৪৯, ৪৬৩]
সুতরাং, এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুসলমান যে এলাকা বা যে স্থানেই থাকুক, যে ভাষা ও বর্ণভুক্ত হোক, তারা সকলে একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম আঞ্চলিক কিংবা ভাষা বা গোত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে না। বরং ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বব্যাপী একক জাতীয়তাই হচ্ছে ইসলামের জাতীয়তাবোধ।
আজকের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ যাই বলা হোক না কেন, তা সবই ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। কোন মুসলমান তা সমর্থন করতে পারেনা বা তার পক্ষে মদদ যোগাতে পারে না।
সুতরাং, আসুন, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে চিরতরে বর্জনের পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী কুফরী জাতীয়তাবাদকে এবং ধর্মবিবর্জিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপেক্ষা ও বিদূরিত করে সকলে ইসলমী আদর্শের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাই। আজ এটাই আমাদের ঈমানের দাবি।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব

মহান স্রষ্টা এ বিশাল পৃথিবীকে সৃষ্টি করে তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীজতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য সুপরিকল্পিত ও সুসংহত কর্মসংস্থান ও দায়িত্বসমূহ নিরুপণ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কিছু কিছু কর্মক্ষেত্র এমন রয়েছে, যেগুলো নারী–পুরুষ উভয়ের জন্য সমান, যেমন–শিক্ষাগ্রহণ– শিক্ষাদান দ্বীন প্রসারে দাওয়াত ও তাবলীগ ইত্যাদি। তবে তা অবশ্যই শরী'আত অনুমোদিত পন্হায় হতে হবে। আবার কিছু কিছু কর্মক্ষেত্র এমন, যা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। যেখানে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে না। যেমন–নামাযের ইমামতী। আবার কিছু কর্মক্ষেত্র এমন রয়েছে, যা শুধু নারীদের জন্য নির্ধারিত। যেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। যেমন–সন্তান ধারণ।

জাতীয় নেতৃত্ব বা শাসন কার্য পরিচালনা এমন একটি কর্মক্ষেত্র, যা শরী'আতে এককভাবে পুরুষের জন্যই নির্ধারিত। সেখানে নারীদের অংশগ্রহণ মোটেও ঠিক নয়। তদুপরি এমনটি করতে গেলে, তা একদিকে যেমন সমস্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করে, অপরদিকে তা চরম শরী'আত গর্হিত বিষয়ও বটে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–পুরুষরা মহিলাদের কর্তা বা পরিচালক এ ভিত্তিতে যে, আল্লাহ তা'আলা এককে (পুরুষ) অপরের (মহিলা) উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। [সূত্র : সূরাহ নিসা :৩৪]

(১) পুরুষরা মহিলাদের শাসনকর্তা ও রক্ষক, কেননা–পুরুষদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

(২) নারীরা নবী ও রাসূল হতে পারে না।

(৩) নারীসমাজ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না।

(৪) নারীরা কোন প্রকার নামাযে ইমাম হতে পারবে না। (যারা ক্ষুদ্র জামা'আতের ইমামতি করতে পারে না, তারা বৃহৎ জামা'আতের ইমামতি অর্থাৎ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে পারে?)

(৫) নারীদের আযান গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৬) কিসাস বা হত্যার দায়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর করা সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীদের স্বাক্ষীর উপর নির্ভর করা যাবে না।
(৭) কারো প্রতি কোন দন্ডাদেশ কার্যকর করার জন্য নারীর স্বাক্ষীর উপর নির্ভর করা যাবে না।
(৮) সাধারণ অবস্থায় নারীদের উপর জিহাদ ফরজ নয়।
(৯) অসামঞ্জস্যতা থাকলে, সেক্ষেত্রে নারীরা তাদের বিবাহ পূর্ণ করতে পারে না। বরং তা ওলীর অভিভাবকের অনুমোদনের উপর মওকুফ থাকে।
(১০) তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে শুধু নারীর ইচ্ছা মোটেও কার্যকর নয়। [সূত্র : তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৪৯১, তাফসীরে রুহুল মা'আনী ৩/২৩, তাফসীরে কাবীর ১০/৮৮, তাফসীরে মাযহারী ২/৯৮]
উল্লেখিত ব্যাখ্যায় যে সব কর্মক্ষেত্রে নারীদের কর্ম সম্পাদন কার্যকর নয় বলে তা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছে, তার সবগুলোই মূলতঃ নেতৃত্ব সংক্রান্ত। তবে কোনটা প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ বহন করে, আবার কোনটা প্রমাণ বহন করে পরোক্ষ রুপের।
পারস্য সম্রাট কিসরার পতনের পর তথায় একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,- "ঐ জাতি কখনো কামিয়াব হবে না, যে জাতির পরিচালক মহিলা হবে"। [সূত্র :বুখারী]
অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "পুরুষগণ যখন মহিলাদের নেতৃত্ব স্বীকার করবে, তখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য"। [সূত্র : মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪/২১৯]
অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যখন সৎ ও ন্যায়পরায়ন লোক তোমাদের শাসক হবে এবং তোমাদের মধ্যকার সমর্থবান লোকেরা দানশীল হবে, আর তোমরা যখন তোমাদের জাতীয় কর্মকান্ড পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সমাধা করবে, এ পরিস্থিতিতে তোমাদের জীবন মৃত্যু অপেক্ষা উত্তম। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসক হবে জালিম, আর সম্পদশালী লোকেরা কৃপণতা করতে থাকবে এবং তোমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সম্পাদনের দায়িত্ব মহিলার হাতে অর্পণ করা হবে, মনে রেখো-এমতাবস্থায় তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই হবে উত্তম। (অর্থাৎ এ অবস্থায় তোমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে

মৃত্যুবরণ করা উত্তম। তোমরা ঐ অবস্থা দূরীকরণের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে কামিয়াবী অর্জন কর, অথবা প্রচেষ্ঠা চালাতে মৃত্যুবরণ কর।)
উল্লেখিত হাদীস সমূহ থেকে অতি সহজেই ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলা নেতৃত্বের সঠিক অবস্থান নিরুপণ করা যায়। প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-মহিলা নেতৃত্বকে দেশ ও জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও সফলতার পথে অন্তরায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, বিশ্বনবী সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মহিলা নেতৃত্বের অভিশাপ কোন জাতির স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়া মানে তার নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে আনা।
অপর দুই হাদীসে মহিলা নেতৃত্ব গ্রহণ পুরুষ জাতির জন্য চরম লজ্জাকর ও অহিতকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে-মহিলাদের হাতে যখন জাতির রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন ভাবতে হবে-তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই উত্তম। অর্থাৎ এমতাবস্থায় জীবন যাপন এতই অহিতকর যে, তখন জীবনের থেকে মৃত্যুকেই উত্তম বলা হয়েছে।
এছাড়া মহিলাদের উপর অপির্ত "ফরযে আইন" বা অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির মধ্যে পর্দা অন্যতম। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহিলাদের প্রতি নির্দেশ করে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থানরত থাক। অন্ধযুগের মহিলাদের ন্যায় বাহিরে (বেপর্দায়) ঘোরাফেরা করো না"। [সূত্র : সূরাহ আল আহযাব, আয়াত-৩৩]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "মহিলাদের উপর জিহাদ, জুমু'আ ও জানাযার নামায ফরয নয়। (মাযমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৭০) এ সকল ইবাদতগুলো মহিলাগণের উপর ফরয না হওয়ার মূল কারণ হলো তাদের পর্দা রক্ষা করে চলার ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা শরী'আতে মহিলাগণের পর্দার গুরুত্ব ও অবস্থান সহজেই অনুমেয়। আর নেতৃত্ব এমন একটি দায়িত্ব যা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পাশাপাশি পর্দা রক্ষা আদৌ সম্ভব নয়। বরং নেতৃত্ব পর্দা লঙ্ঘনের হাজারো দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।
ইসলামে মহিলাদের আওয়াযকে অপর পুরুষ থেকে সে ভাবেই সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেভাবে তার দেহের অংগ প্রত্যংগ সংরক্ষণের নির্দেশ রয়েছে। অথচ নেতৃত্ব করার জন্য তাকে প্রতিদিন বিচার-আচার সভা-সমিতিতে জনগণের সামনে বক্তৃতা বিবৃতিসহ ইত্যাদি হাজারো

কর্মকান্ড আনজাম দিতে হয়। দেশের জনসাধারণকে তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাদি নিয়ে তার দরবারে হাজির হতে হয়। অতএব, একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, নেতৃত্ব ও পর্দা এমন দু'টি বস্তু যা এক সাথে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, একটা জাতির প্রশাসন বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রদান রাষ্ট্রের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সে মতে এ কাজের, সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন ভারসাম্য পূর্ণ সুস্হ মন মানসিকতার, অপরদিকে প্রয়োজন যথার্থ ও পূর্ণ আকল বা জ্ঞানের। অথচ হাদীস শরীফে মহিলাদেরকে 'নাকিসাতুল আকল' বা জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক বলা হয়েছে। এ কারণেই মহিলাদের দুইজনের সাক্ষী পুরুষের একজন সাক্ষীর সমান ধরা হয়েছে। এ ধরনের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারিনী নারী দেশের নেতৃত্ব কিভাবে আন্‌ঞ্জাম দিতে পারে?

এতক্ষণের আলোচনায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে একথা সুপ্রমাণিত হলো যে, ইসলাম মহিলাদের ছোট ইমামতী দেয়া তথা মসজিদে নামাযের ইমামতী করার অনুমতি দেয়নি, ঠিক তেমনি তাদের বড় ইমামতী তথা দেশের নেতৃত্ব বা শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করারও অনুমতি দেয়নি। এরপরেও তা করতে যাওয়া হবে চরম শরী'আত গর্হিত ও ইসলাম বিরোধী কাজ এবং দেশ ও জাতির ধ্বংসের কারণ।

মহিলা নেতৃত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে "ইজমায়ে আইম্মাহ" বা ইমামগণের ঐক্যমত সুপ্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাযম (রহ) বলেন- সমস্ত ইমামগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে- কোন মহিলার হাতে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব অর্পণ সম্পূর্ণ অবৈধ। ইমাম বাগভী (রহ) বর্ণনা করেন- "ইমামগণও এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছছেন যে, মহিলারা নেতৃত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রাখে না।" কেননা-ইমাম বা নেতাকে জিহাদ পরিচালনা বা মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাহিরে বের হতে হয়। অথচ মহিলারা পর্দায় থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশিত। [সূত্র : শারহুস সুন্নাহ ১০/৭৭]

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ) বলেন- "এ বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মহিলাগণ রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবে না। এক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য নেই। [সূত্র: আহকামুল কুরআন-৩/১৪৪৫]

এ ছাড়া নেতৃত্বদানের জন্য শর্ত হলো- নেতাকে মুসলিম, পুরুষ, পূর্ণ বয়স্ক বালিগ এবং সুস্হ জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। নারীদের মধ্যে এসব শর্ত

অনুপস্হিত। প্রথম শর্তই অর্থাৎ পুরুষ হওয়ার শর্ত নারীদের ক্ষেত্রে নেই তা সুস্পষ্ট। এ ছাড়া অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নারীরা জ্ঞান ও ধর্মের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ।" [সূত্র: শরহে আকাইদ, ১৪৬]

এমনিভাবে ফিকাহ শাস্ত্রের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য গ্রন্হ ফাতাওয়া শামী'তে উল্লেখ রয়েছে- নরীরা মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে বা রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে না। কেননা-তাদেরকে পর্দায় ঘরের মধ্যে অবস্হান করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং পর্দায় থাকা তাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। যেমন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঐ জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না, যে জাতির রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হবে নারী।" [সূত্র: শামী-১/৫৪৮/ জাওহারুল ফাতাওয়া-৪১১-৩২০, ইযালাতুল খাফা-১/১৯] উল্লেখিত উদ্বৃতি সমূহ থেকে ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে মহিলা নেতৃত্বের অসারতা ও অবৈধতা প্রমাণিত হলো।

অতএব, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস বা যুক্তির বিচারে নারী নেতৃত্ব সম্পূর্ণ অবৈধ। এ ক্ষেত্রে অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে যে, জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রযুদ্ধে হযরত আয়িশা(রা)-এর নেতৃত্ব প্রদান মহিলা নেতৃত্বের বৈধতার প্রমাণ নয় কি?

এ ধারণা নিতান্তই ভুল। কেননা-প্রথমত: হযরত আয়িশা সিদ্দীক (রা) সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গমন করেননি এবং সেখানে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানও তার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সকল উম্মতের মা হেতু ইসলামী বিধান মতে হযরত উসমান (রা) এর শাহাদাতের কিসাস গ্রহণ ও এ নিয়ে মুসলমানদের পরস্পরের মতবিরোধের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যই তথায় উপস্হিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত: হযরত আয়িশা সিদ্দীক (রা) লোকদের তার ইন্তিকালের পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পার্শ্বে দাফন করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর তিনি নিজেই অনুতপ্ত হয়ে বলেন: আমাকে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দাফন করোনা। বরং অন্যান্য বিবিদের সাথে "জান্নাতুল বাকী" নামক স্হানে দাফন

করো। কারণ–আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ইন্তিকালের পর একটি বিদ‘আত কাজ করে ফেলেছি বিধায় আমি তার পার্শ্বে দাফন হতে লজ্জাবোধ করছি। [সূত্র :মুসতাদারাকে হাকিম, ২/৬]
এখানে বিদ‘আত বলে তিনি জঙ্গে জামালে অংশ গ্রহণকেই বুঝিয়েছেন– অন্য বর্ণনা দ্বারা তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।
তৃতীয়ত : হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) যখন সালিশী কাজে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখনই হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর অন্যান্য বিবিগণ (রা) তাঁকে এ কাজ থেকে বারণ করেন এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) একটি নাতিদীর্ঘ চিঠি লিখে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। উপরন্তু পথিমধ্যে “হাওআব” নামক স্থানে এসে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)–নিজেই সামনে বাড়তে অনিচ্ছা ব্যক্ত করেন। কারণ–রাত্রে চতুর্দিকে কুকুর ডাকতে থাকলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর একটি হাদীস তার স্মরণ আসে এবং সামনে অগ্রসর হতে সংশয় বোধ করেন। পরে কিছু লোকের গলদ তথ্য দেয়ায় তিনি তথায় যান। এবং পরবর্তীতে এ কারণে আজীবন আফসোস করেন।
এসব কিছুর পরও হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)–এর জংগে জামাল বা উষ্ট্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ঘটনাকে মহিলা নেতৃত্ব বৈধ করার পক্ষে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করার চেষ্টা করা নিছক বাতুলতা বৈকি?
এক্ষেত্রে বিলকিসের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা–
(ক) বিলকিস ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একটি কাফের রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। কোন মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না।
(খ) যদি ধরে নেয়া হয় হযরত সুলাইমান (আ) তাঁকে পূর্ব পদে বহাল রেখেছিলেন, তাহলে তা দ্বীন–ই সুলাইমানীতে (আ) বৈধ বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সে জন্য দ্বীনে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা ইসলামে তা বৈধ হওয়া আদৌ প্রমাণিত হয় না কারণ–এক নবীর শরী‘আত অন্য নবীর (আ) এর জন্য শরী‘আত হওয়া জরুরী নয়। বরং হুকুম–আহকামে দুই নবীর (আ) এর শরী‘আতের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। [সূত্র : বয়ানুল কুরআন, ২/৮৫ তাফসীরে রুহুল মা‘আনী–১০/২১০/ তাফসীরে কুরতভী–১৩/২১১]
অনেকে বলে থাকে যে, হররত মাওঃ আশরাফ আলী থানবী (রহ) মহিলা নেতৃত্ব বৈধ বলতেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভুল।

কারণ–তাঁর লিখিত জগদ্বিখ্যাত তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের শরী'আতে মহিলাগণের নেতৃত্বের কোন অবকাশ নেই। (তাফসীরে সূরাহ নমল ২/৮৫) তাছাড়া তিনি তাঁর ফাতওয়ার কিতাব ইমদাদুল ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর রাষ্ট্রনায়ক বা নেতা কোন মহিলাকে বানানো বৈধ নয়। কারণ–এটা কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত নয়। বরং কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী।

পাশ্চাত্য সমাজ দর্শনের নগ্ন উম্মত্ততা আজ আমাদের নারী সমাজকে তাদের সঠিক অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। কেননা–ইসলাম ও পাশ্চাত্যের নোংরা সমাজনীতি একে অপরের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে আমদের সমাজের একশ্রেণীর লোলুপ–কুলাংগার নিজেদের ভোগ–লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্যই শান্তিপূর্ণ নিবাস থেকে স্কুল–কলেজ, অফিস আদালত, গার্মেন্টস–ফ্যাক্টরী তথা সর্বত্র নারীকে টেনে এনেছে এক নির্লজ্জ পরিবেশে। এর ভয়াবহ বিষক্রিয়া থেকে দেশ জাতিকে বিশেষতঃ নারী সমাজকে রক্ষা করতে হলে, আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে ইসলাম প্রদত্ত আদর্শপূর্ণ ও যুক্তি সংগত সমাজ দর্শন আল্লাহ বিধানের দিকে। এ পথ ছাড়া শান্তির কোন পথ নেই।

উল্লেখ্য কোন সময় যদি মহিলা নেতৃত্বের থেকে পুরুষ নেতৃত্ব নিকৃষ্টতম হয় এবং পুরুষ নেতৃত্ব ইসলাম–কুরআন–সুন্নাহ এর বেশি ক্ষতিকর হয় তাহলে সেরূপ পরিস্থিতিতে হক্কানী মুফতীয়ানে কিরামের ফাতাওয়া–এর উপর আমল করতে হবে।

সমাপ্ত